১০ই নভেম্বর স্মরণে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

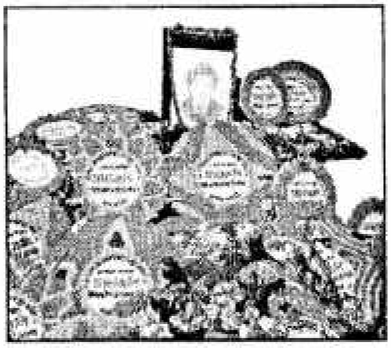

তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি

১০ই নভেম্বর স্মরণে

প্রকাশকাল:
১০ নভেম্বর ২০১৩

প্রকাশনায়:
তথ্য ও প্রচার বিভাগ
পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি
কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি
ফোন: +৮৮-০৩৫১-৬১২৪৮
ই-মেইল: pcjss.org@gmail.com, pcjss@hotmail.com
ওয়েব: www.pcjss-cht.org, ipdpcjss.wordpress.com

মূল্য: ৫০ টাকা

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১

প্রবন্ধ

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অবদান ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা—মঙ্গল কুমার চাকমা ২

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা—সুদত্ত চাকমা ৭

এম এন লারমার আদর্শ কখনও ধ্বংস হতে পারে না—বাচ্চু চাকমা ১৩

আত্মপরিচয়ের বঞ্চিত সমীকরণ—পাভেল পার্থ ১৪

এম এন লারমা: যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন—ধীরকুমার চাকমা ১৯

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে সংঘাত ও কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয়—উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা ২২

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী মুক্তি আন্দোলন—জড়িতা চাকমা ২৬

আদিবাসীর আত্মপরিচয়ের লড়াই—ফারহাত জাহান ২৯

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাথে সেনাবাহিনীর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে—অনুরাগ চাকমা ৩১

তাইন্দং-এ ফিরে আসে যশোর রোড ১৯৭১—দীপায়ন খীসা ৩৩

বিজ্ঞজনের অর্বাচিনসুলভ বক্তব্য অনভিপ্রেত—সত্যবীর দেওয়ান ৩৪

আওয়ামী লীগের সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা—সমীচিন চাকমা ৩৭

কবিতা

আমি বাংলাদেশী, কিন্তু বাঙালি নই—ত্রিজিনাদ চাঙমা ৪১

রুখে দাঁড়াও কাচালং—শরৎ জ্যোতি চাকমা ৪২

বিশেষ প্রতিবেদন

'ধীরে চলো নীতি' গ্রহণ করত: পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের কাজ সরকার অবশেষে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে ৪৩

অপহৃত ৫২ জনের মধ্যে তিন দফায় ৪৮ জনকে ছেড়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, লুকোচুরির পর অবশিষ্ট ৪ জনের মুক্তি ৪৫

সংবাদ প্রবাহ

সেটেলার বাঙালিদের সামম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি জবরদখল ৪৭

জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা ৫২

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর হয়রানি ও নির্যাতন ৫৫

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা ৫৬

সাংগঠনিক সংবাদ ৬৪

সম্পাদকীয়

মহান নেতা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও জুম্ম জাতির জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত সাবেক সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় তিনি নৃশংসভাবে শাহদাৎ বরণ করেন। চার কুচক্রী নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির আশায় ও কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান চিন্তাবিদ, আপোষহীন সংগ্রামী, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর শাশ্বত দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে শহীদ এম এন লারমা জীবন্ত এম এন লারমার চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী, আরো বেশি দুর্বার।

এম এন লারমার গড়ে তোলা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলনের ফসল হিসেবে স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হলেও এবং পরবর্তীতে ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের' অঙ্গীকার করলেও দু দু'টি মেয়াদে সরকার এ চুক্তি বাস্তবায়নে সক্রিয় ও আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার অব্যবহিত পরে সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের কিছু উদ্যোগ নিলেও তা ছিল মূলতঃ কতিপয় কমিটি পুনর্গঠন বা কমিটির উচ্চ পদে দলীয় সাংসদ বা নেতা-কর্মীদের নিয়োগ প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে পূর্বে হস্তান্তরিত বিভাগের অন্তর্গত ৫টি কর্ম/প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করলেও অহস্তান্তরিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, মাধ্যমিক ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, রক্ষিত নয় এমন বন, পরিবেশ, স্থানীয় পর্যটন ইত্যাদি বিষয়গুলো হস্তান্তরের কোন কার্যকর উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেনি। ক্ষমতায় আসার পর সরকার কাপ্তাই ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও তারপর থেকে চুক্তি অনুসারে অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

বর্তমান সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনের কাজ শুরু হয়। বিগত ৫ বছরে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি সর্বশেষ মন্ত্রীসভা ও জাতীয় সংসদেও উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ সরকার এই আইন সংশোধনের কাজ ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। একইভাবে বিগত পাঁচ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি। বিগত পাঁচ বছরে আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা চূড়ান্তকরণে ও ভূমি কমিশন আইন সংশোধনে চরম ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা কতটুকু ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, সরকারের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির প্রভাব, পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সেনা কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকার কারণে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

পূর্বের মতো এ সরকারও জুম্ম জনগণসহ দেশের অবহেলিত-উপেক্ষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভূমির অধিকার অস্বীকার করে চলেছে। দেশের সর্বত্র আদিবাসী জাতিসমূহের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে। তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠেছে। পূর্বের মতো এ সরকারের আমলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে ৭টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে যেখানে জুম্মদের শত শত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়েছে।

অপরদিকে ইউপিডিএফ নামধারী পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং তার সাথে সংস্কারপন্থী নামে খ্যাত সুধাসিন্ধু-রূপায়ণ-তাতিন্দ্র গোষ্ঠী সরকারের বিশেষ মহলের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে পার্বত্য চট্টগ্রামে হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে এবং এসব সন্ত্রাসী অপতপরতার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করে চলেছে। তারা গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের উত্তরসূরীর ভূমিকা নিয়ে জুম্ম জনগণের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে পেছন থেকে ছুরিকাঘাত করে চলেছে। এই নব্য বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ আজ জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের মতো তারাও আজ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

এমতাবস্থায় আসুন, মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে শপথ নিই, মহান নেতা এম এন লারমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তাঁর প্রদর্শিত নীতি-আদর্শে সজ্জিত হয়ে সকল প্রকার নব্য বিভেদপন্থী ও ষড়যন্ত্রকারীদেব বিষদাঁত ভেঙে দিই, চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হয়ে সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য করি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার অবদান ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

মঙ্গল কুমার চাকমা

মহান বিপ্লবী, জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত ও সাবেক সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ। সশস্ত্র সংগ্রাম চলাকালে ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর চার কুচক্রী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশের এক বিশ্বাসঘাতকতামূলক অতর্কিত হামলায় তিনি নৃশংসভাবে শাহদাৎ বরণ করেন। চার কুচক্রী নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির আশায় কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত, মহান চিন্তাবিদ, আপোষহীন সংগ্রামী, নিপীড়িত জাতি ও মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু এম এন লারমাকে প্রাণে হত্যা করলেও তাঁর শাশ্বত দর্শন ও বিপ্লবী চেতনাকে নিঃশেষ করে দিতে পারেনি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে শহীদ এম এন লারমা জীবন্ত এম এন লারমার চেয়ে আরো বেশী শক্তিশালী, আরো বেশী দুর্বার।

মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। দ্রুত অবলুপ্তির অভিমুখে ধাবমান জুম্ম জনগোষ্ঠীকে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে যেভাবে তিনি জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তা মুক্তিকামী সংগ্রামী গণমানুষের কাছে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। অধিকন্তু সংসদীয় জীবনে তিনি সাংসদ হিসেবে যে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বাগ্মীতা, দেশপ্রেম, সততা, নির্ভীকতা, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন তা বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। ব্যক্তি হিসেবে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত হলেও তিনি কখনো জাতিগত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি জুম্ম জনগণের দাবিদাওয়ার পাশাপাশি সারাদেশের অবহেলিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত সাধারণ মানুষের কথা সংসদের ভেতরে ও বাইরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরেছিলেন। বস্তুতঃ এম এন লারমা ছিলেন সাধারণ জনগণের সত্যিকারের এক মহান নেতা, মেহনতী মানুষের পরম বন্ধু। নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন অসীম ধৈর্য, মনোবল, আত্মবিশ্বাস ও কষ্ট সহিষ্ণুতার অধিকারী এবং অসাধারণ আদর্শবান, সৃজনশীল রাজনীতিক ও আপোষহীন সংগ্রামী।

ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন মৃদুভাষী, আচার-ব্যবহারে অমায়িক, ভদ্র, নম্র, ক্ষমাশীল, সৎ, নিষ্ঠাবান ও সুশৃঙ্খল এবং সাধাসিধা জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। তিনি সৃজনশীল মেধার অধিকারী ছিলেন। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি কর্ম ও পেশাগত জীবনে শিক্ষক ও আইনজীবী হিসেবেও বিচক্ষণতা ও সফলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম ও খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পাঠদানের পদ্ধতি ছিল খুবই আকর্ষণীয়। অতি সহজে তিনি কঠিনতম বিষয়বস্তু সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিতে পারতেন। শিক্ষক জীবনে তিনি ছাত্র সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি অধিকার-হারা জুম্ম জনগণের মর্মবেদনা অনুভব করতে পেরেছিলেন। প্রজা শ্রেণীর উপর অভিজাত শ্রেণীর শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছোটকাল থেকেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। তিনি ছাত্র জীবন থেকেই স্বীয় সমাজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন।

নিদ্রামগ্ন জুম্ম জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত করা

এম এন লারমার সবচেয়ে বড় অবদান হলো- রাজনৈতিকভাবে অসচেতন ও অনেকটা নিদ্রামগ্ন জুম্ম জাতিকে জাতীয়তাবাদী চেতনায় জাগরিত করে রাজনৈতিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জনগণ একের পর এক বিজাতীয় শাসকগোষ্ঠীর নির্মম ও বর্বরোচিত দমন-পীড়নে জর্জরিত হয়ে জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব যখন চরম অবলুপ্তির পথে ধাবিত হচ্ছিল ঠিক তখনি মুক্তির অগ্নিমন্ত্র নিয়ে জুম্ম জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হন অসাধারণ প্রতিভাধর মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। তাঁরই নেতৃত্বে জুম্ম জনগণের প্রথম ও একমাত্র লড়াকু রাজনৈতিক পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সূচিত হয় জুম্ম জাতির দুর্বার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আন্দোলন।

সর্বপ্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন

এম এন লারমাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সর্বপ্রথম দেশের জাতীয় পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বায়ত্তশাসনের কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর পরই তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন আদায়ের জন্য জাতীয় পর্যায়ে দ্বারে দ্বারে ধর্না দেন। বাংলাদেশের কতিপয় রাজনৈতিক দল থেকে এ বিষয়ে সমর্থনের আশ্বাসও তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ তা ছিল কেবল মুখের বুলি ও কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাস্তব ক্ষেত্রে বিশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করে কোন দলই এগিয়ে আসেনি। ফলতঃ এম এন লারমা জুম্ম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক আন্দোলন ও একটি শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দল গঠনে প্রয়াসী হন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসন কাঠামো এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষাপটে সংবিধানে সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির নিকট স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলে ধরেন। তিনি ১৬ সদস্যের এক জুম্ম প্রতিনিধিদল নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও দেখা করেন। কিন্তু তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর উগ্র জাতীয়তাবাদী দাম্ভিকতায় জুম্ম জনগণের সকল ন্যায্য

দাবি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এতে করে জুম্ম জনগণের সকল গণতান্ত্রিক প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বাংলাদেশকে নিয়ে ছিল তাঁর গভীর স্বপ্ন ও ভাবনা

বস্তুত সদ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশে এম এন লারমার রয়েছে অসামান্য অবদান। গণপরিষদে ও প্রথম জাতীয় সংসদে দেশের নব্য শাসকগোষ্ঠীর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রবল সমুদ্রে দু'একজন বিরোধী/স্বতন্ত্র সদস্যের মধ্যে অন্যতম এন এন লারমা নির্ভীক চিত্তে বলিষ্ঠকণ্ঠে একাই লড়াই করে গেছেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর ছিল অনেক স্বপ্ন ও গভীর ভাবনা। তিনি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধান রচনার সময় তাঁর সেই স্বপ্ন বারে বারে উচ্চারণ করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে, দেশের সংবিধান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে এবং সকল প্রকারের জাতিগত–শ্রেণীগত নিপীড়ন, শোষণ–বঞ্চনার অবসান ঘটাবে। তাঁর বুকভরা আশা ছিল, সংবিধানে জাতি–শ্রেণী নির্বিশেষে সকলেরই অধিকার সংরক্ষিত হবে এবং উপনিবেশিক অপশাসনের সকল কালাকানুন ও দমনপীড়নের চির অবসান হবে।

বাংলাদেশকে নিয়ে তাঁর সেই স্বপ্নের কথা সুন্দরভাবে উচ্চারণ করেছিলেন সংবিধান-বিলের উপর ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে গণপরিষদে প্রদত্ত ভাষণে। তিনি বলেছিলেন, "গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ হবে আমাদের জন্মভূমি বাংলাদেশে। ...আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র হবে, দেশে অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ-কিছুই থাকবে না। শুধু থাকবে মানুষে মানুষে প্রেম, প্রীতি, মায়া, মমতা এবং তার দ্বারা এক নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। মানবতার এই ইতিহাস থাকবে এবং তাতে লেখা থাকবে 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই'। আমি আজ কামনা করি, তাই হোক।"

তিনি আরো বলেছিলেন, "দেশকে আমি যেভাবে ভালোবেসেছি, যেভাবে আমার মনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি, যেভাবে আমি কোটি কোটি মানুষের একজন হয়ে দেখেছি, সেইভাবে এই মহান গণপরিষদে বলেছি। ...আমি বলেছিলাম অধিকার হারা মানুষের কথা, বঞ্চিত মানুষের কথা, যাঁরা কল-কারখানায় চাকুরি করে, সেই শ্রমিক ভাইদের কথা, যাঁরা দিনরাত রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, শক্ত মাটি চাষে সোনার ফসল ফলায়, সেই চাষী ভাইদের কথা। যাঁরা রাস্তায় রাস্তায় রিক্সা চালিয়ে কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে, আমি তাঁদের কথা বলেছিলাম। আমি বলেছিলাম সেই ভিখারীদের কথা, যাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে 'আমাকে একটা পয়সা দাও' বলে।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল সুদূর প্রসারী গভীর প্রতিরক্ষা ভাবনা। তিনি ২৩ জুন ১৯৭৩ জাতীয় সংসদে বাজেটের উপর আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "দেশ রক্ষার জন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে। ডিফেন্স বাজেট করা হয়েছে ৪৭ কোটি মাত্র-জল, আকাশ এবং স্থলবাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র-এ সুসজ্জিত করতে হবে। ....আমার মনে হয় প্রত্যেক বাহিনীর জন্য এর ৩ গুণ অর্থাৎ ৪৭ কোটি টাকা করে বরাদ্দ করা প্রয়োজন ছিল। যারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, সিভিল গভর্ণমেন্টকে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকবে, তাদের রণ-সম্ভার বেশি থাকবে। ...এজন্য সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার জন্য সরকারকে মনোনিবেশ করতে হবে।" এম এন লারমার এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি তাঁর কত গভীর ভালোবাসা ছিল তা সহজেই বুঝা যায়। অথচ এ দেশের শাসকগোষ্ঠী তাঁকে বিচ্ছিন্নবাদী, দুষ্কৃতকারী, উচ্ছৃঙ্খল তরুণ হিসেবে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালায়।

দেশ আজ সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন, কালো টাকা, পেশীশক্তি, দলবাজিতে ছেয়ে গেছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে শাসকগোষ্ঠী পালাক্রমে দেশে লুটপাটের হলিখেলায় মেতে উঠেছে। ১৯৭২ সালের ২৫ অক্টোবর সংবিধান বিলের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এম এন লারমা এরকম পরিণতিরই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেন, "...একদিকে হিংসাদ্বেষ-বিহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর অন্যদিকে উৎপাদন-যন্ত্র ও উৎপাদন-ব্যবস্থাসমূহের মালিকানা, রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায়ী মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ রেখে শোষণের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা এমন একটা ক্ষমতা দেখতে পাচ্ছি, যে ক্ষমতা বলে সরকার একটা লোককে এক পয়সার অধিকারী হতে দেবেন এবং অন্য একটা লোকের জন্য এক কোটি মালিকানার অধিকার রেখে দেবেন।" বস্তুতঃ এম এন লারমার এই মূল্যায়ন এক ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হতে আমরা দেখেছি। তাই দেশের এই সংকটকালে যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র বারে বারে মুখ থুবড়ে পড়ছে সেখানে এম এন লারমার আদর্শ ও স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

তিনি ছিলেন দেশের একজন জাতীয় নেতা

ব্যক্তি হিসেবে সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর বংশোদ্ভূত হলেও এম এন লারমা কখনো জাতিগত সংকীর্ণ পরিসরে আবদ্ধ থাকেননি; তিনি জুম্ম জনগণের দাবীদাওয়ার পাশাপাশি সারাদেশের অবহেলিত ও উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের কথা সংসদের ভেতরে ও বাইরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তুলে ধরেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের পাশাপাশি দেশের শোষিত-বঞ্চিত কৃষক-শ্রমিক-মাঝিমাল্লা-কামার-কুমার-জেলে-তাঁতী-পতিতাদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ছিলেন তিনি সর্বদা সোচ্চার ও প্রতিবাদী। তিনি বার বার দেশের বাস্তু-হারাদের সমস্যা, ভিক্ষুকদের সমস্যা, কুলি-মজুরদের সমস্যা, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবন-যাপন করে, সেই কৃষকদের সমস্যার প্রতি সরকারের বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দেশের শোষণ-ভিত্তিক অর্থনীতিকে ভেঙ্গে আস্তে আস্তে করে সম্পদের অধিকার জনগণকে দিতে হবে বলে বার বার উত্থাপন করেছিলেন।

দেশের সকল সম্প্রদায়ের সমঅধিকার ও সমমর্যাদা বিষয়ে তিনি ছিলেন সর্বদা সোচ্চার। তাই তিনি জাতীয় সংসদ অধিবেশন

আরম্ভকালে কেবল কোরান ও গীতা পাঠ করলে তার বিরুদ্ধে তিনি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেছিলেন, "শপথ গ্রহণের আগে আমাদের দিনের কর্মসূচি যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন পবিত্র কোরান থেকে 'সুরা' পাঠ এবং গীতা থেকে শ্লোক পাঠ করা হয়েছে। এখন আপনার মাধ্যমে এই পরিষদের নিকট আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, এই পরিষদে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোক প্রতিনিধিত্ব করছি। বাংলাদেশে শুধু হিন্দু ধর্মাবলম্বী বা শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক নাই- বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী লোকও আছেন।"

তাই পবিত্র কোরান পাঠ এবং গীতা পাঠের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ত্রিপিটক এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল থেকেও পাঠের প্রয়োজন রয়েছে কিনা তিনি স্পিকারকে প্রশ্ন করেন। তারপর থেকে সংসদ অধিবেশন আরম্ভকালে কোরান থেকে 'সুরা' পাঠ এবং গীতা থেকে শ্লোক পাঠের পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ত্রিপিটক এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বাইবেল পাঠ করা হতো। কিন্তু বর্তমানে জাতীয় সংসদের সেই ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে। জাতীয় সংসদ অধিবেশন আরম্ভকালে ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করতে খুব কমই দেখা যায়।

"আমি বাঙালী নই"- বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ

বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে ৩১ অক্টোবর ১৯৭২ একটি ঐতিহাসিক কালো দিন। ঐদিন আওয়ামী লীগের সদস্য আহম্মদ রাজ্জাক ভূঁইয়ার প্রস্তাবিত "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন" সম্বলিত সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র জাতীয় সত্তার অধিকারী জুম্ম জনগণসহ দেশের প্রায় ৪৫টি সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে সাংবিধানিকভাবে বাঙালি বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এম এন লারমা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছিলেন- "আমি যে অঞ্চল থেকে এসেছি, সেই পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীরা যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে বাস করে আসছে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষায় বাঙালিদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে আসছি। বাংলাদেশের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক দিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা। আমার বাপ, দাদা, চৌদ্দ পুরুষ- কেউ বলে নাই, আমি বাঙালি।" তিনি সেদিন এই সংশোধনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে গণপরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন।

গত ৩০ জুন ২০১১ বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আবারও জুম্ম জনগণসহ আদিবাসী জাতিসমূহকে "বাঙালী" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ভিন্ন ভাষাভাষি অর্ধ শতাধিক আদিবাসী জাতিসমূহকে এক কলমের খোঁচায় 'বাঙালী' পরিচিতি প্রদান কত বড় অগণতান্ত্রিক, উগ্র জাত্যাভিমানী ও জাতি-আগ্রাসী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যে মীমাংসিত একটা বিষয়কে নতুন করে অহেতুকভাবে তুলে এনে বর্তমান শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার যে বিতর্ক ও সংঘাতের ক্ষেত্র জন্ম দিয়েছে তা কখনোই দেশের গণতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে না।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এ দেশে বৃহত্তর বাঙালি জাতি ছাড়াও অর্ধ শতাধিক আদিবাসী জাতি স্মরণাতীত কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এসব জাতিসমূহ যুগ যুগ ধরে নিজস্ব সমৃদ্ধ সমাজ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-ভাষা ও স্বতন্ত্র নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি নিয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করে আসছে। তাদের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস, সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, দৈহিক-মানসিক গঠন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনযাত্রা ইত্যাদি বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আদিবাসীরা নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশী, কিন্তু জাতি হিসেবে কোনক্রমেই বাঙালী নয়। তারা জাতি হিসেবে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, খাসি, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহাতো, বর্মন ইত্যাদি অর্ধ শতাধিক এক একটি স্বতন্ত্র জাতি।

৩০ জুন গৃহীত পঞ্চদশ সংশোধনী আদিবাসীদের "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আদিবাসী জাতিসমূহকে অসম্মান ও হেয় প্রতিপন্ন করে চিরবিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছে। পঞ্চদশ সংশোধনীতে "আদিবাসী" শব্দের পরিবর্তে "উপ-জাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়" হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে যা আদিবাসীদের জাতিগত পরিচিতির ক্ষেত্রে অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর। আদিবাসীদের "আদিবাসী" হিসেবে স্বীকৃতি লাভের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবিকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রত্যেক জাতির আত্মপরিচয়ের সহজাত অধিকারকে খর্ব করে অসম্মানজনক ও বিভ্রান্তিকর পরিচিতি চাপিয়ে দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গি উপনিবেশিক, উগ্র সাম্প্রদায়িক, জাত্যাভিমানী ও আগ্রাসী মানসিকতারই প্রতিফলন বলে নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তিনি ছিলেন একজন সচেতন পরিবেশবাদী

এম এন লারমা শুধু মহান রাজনীতিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সচেতন পরিবেশবাদী। তিনি শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত নয়, বরং তা তিনি যৌথ জীবনে এবং জাতীয় জীবনে প্রকৃতিসহ জীব পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রক্ষার নীতি মেনে চলার প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন। বনের পশু রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন বড়ই কড়া। তাই বিলুপ্ত প্রায় কয়েক প্রকার বনের পশুপক্ষী শিকার করার উপর ছিল বিধিনিষেধের পক্ষে ছিলেন। সশস্ত্র আন্দোলনের সময় এটা সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্টিগতভাবে নির্দেশ জারী করা হয়। বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য তিনি সাংগঠনিকভাবে জানিয়ে দেন যে, জুমচাষীরা প্রত্যেক বছর জুম চাষের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় জুম কাটবেন এবং জুম পোড়ানোর সময় সকলে মিলে একসঙ্গে বাতাসের গতি দেখে জুম পোড়াবে। জুমের এলাকার বাইরে আগুন ছড়িয়ে পড়লে চাষীরা সকলেই একসাথে আগুন নেভাবে। ফলে বনজঙ্গল পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ এসে যায় এবং এর সুফল জনগণ বুঝতে পারে।

নারী অধিকার নিয়ে ছিলেন সর্বদা সোচ্চার

নারী অধিকার নিয়ে এম এন লারমা ছিলেন বরাবরই সোচ্চার। তিনি জুম্ম নারীদের করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে খুবই

পীড়িত হতেন, আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়তেন। একাধারে পারিবারিক জীবনে পুরুষের আধিপত্য এবং জাতীয় জীবনে ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের চরম শিকার- এই দ্বৈত অত্যাচার নিপীড়নের মাঝে এম এন লারমা জুম্ম নারী সমাজের মধ্যে এক দুর্বার সংগ্রামী শক্তি প্রত্যক্ষ করতেন। জুম্ম নারী সমাজকে রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করার অপরিহার্যতা তিনি গভীরভাবে অনুভব করতেন। তিনি বলতেন, সামন্ততান্ত্রিক জুম্ম সমাজ নারীদের উপর কেবল শোষণের স্টিম রোলার চালিয়ে এসেছে, নারী সমাজকে কেবল ঘুম পাড়ানির গান শুনিয়ে এসেছে, সর্বোপরি নারীদের উপর ইসলামিক সম্প্রসারণবাদের অত্যাচার নিপীড়ন নিরবে নিভৃতে প্রত্যক্ষ করে এসেছে। কিন্তু তাদের মুক্তির কথা, তাদের অধিকারের জয়গান কেউই কোন দিন শোনাতে এগিয়ে আসেনি। সত্তর দশকে তিনিই সর্বপ্রথম জুম্ম নারী সমাজের মুক্তির বাণী উচ্চারণ করলেন। জুম্ম নারী সমাজকে পুরুষদের আধিপত্য ও পারিবারিক দাসত্ব থেকে মুক্তির মহান প্রয়াসে অধিকার সচেতন করে সংগঠিত করার রাজনৈতিক তাগিদ অনুভব করলেন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি ১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

সংবিধান রচনাকালে নারী সমাজের, বিশেষ করে অবহেলিত ও উপেক্ষিত নিষিদ্ধ পল্লীর নারীদের অধিকার নিয়ে তিনি ছিলেন সোচ্চার। তিনি বলেছিলেন, "সবচেয়ে দুঃখজনক কথা হচ্ছে এই যে, আমাদের মা-বোনদের কথা এখানে (সংবিধানে) নাই। নারীর যে অধিকার সেটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। নারীকে যদি অধিকার দিতে হয়, তাহলে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, সে অধিকার নারীকেও দিতে হবে। ...আজ পল্লীর আনাচে-কানাচে আমাদের যে সমস্ত মা-বোনকে তাদের দেহ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, তাদের কথা এই সংবিধানে লেখা হয়নি। এই সংবিধানে সেই মা-বোনদের জীবনের কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয়নি।"

এম এন লারমার স্বপ্ন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি

এম এন লারমার গড়ে তোলা জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাকার আন্দোলনের ফসল হিসেবে স্বাক্ষরিত হয়েছে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। এই চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাহাড়ী (উপজাতি) অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধান করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের শাসকগোষ্ঠী সেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। শাসকগোষ্ঠী যে দলেরই হোক না কেন তারা পাহাড়ী (উপজাতি) অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাঙালী মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করা এবং জুম্ম জনগণকে জাতিগতভাবে নির্মূলীকরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। তারা একাধারে সমতল অঞ্চল থেকে বাঙালী অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলছে অপরদিকে সেটেলার বাঙালীদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্মদের উপর একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা চালিয়ে জুম্মদের তাদের চিরায়ত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি জবরদখল করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সেই সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতার নামে ইউপিডিএফের মতো সন্ত্রাসী সংগঠনকে মদদ দিয়ে জুম্মদের মধ্যে হানাহানি ও সংঘাত চাপিয়ে দিয়ে চলেছে। বন বিভাগের তথাকথিত বনায়ন, সেনা ক্যাম্প স্থাপন ও সম্প্রসারণ, অস্থানীয় বহিরাগতদের নিকট জুম্মদের প্রথাগত মালিকানাধীন জুমভূমি নির্বিচারে লীজ প্রদান, পর্যটনসহ নানা উন্নয়ন প্রকল্পের নামে জুম্মদের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট কথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব ধ্বংসের জন্য শাসকগোষ্ঠী চতুর্মুখী মরিয়া অপপ্রয়াস চলছে। এমনিতর এক জাতীয় সংকটে জুম্ম জনগণের নাগরিক সমাজকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তাদের মধ্যে যে সংগ্রামী চরিত্র রয়েছে সেটাকে উজ্জীবিত করে এই জাতীয় সংকট মুহূর্তে উদাসীনতা ও প্রশান্তবাদিতায় নিদ্রামগ্ন না থেকে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে তাদের জাগ্রত ও সক্রিয় হতেই হবে।

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, নাগরিক সমাজের অধিকাংশ মানুষই জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন-সংগ্রাম সম্পর্কে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছে। তারা চরম প্রশান্তবাদিতায় দিন অতিবাহিত করছে। তাদের মধ্যে তীব্র বৈষয়িক প্রবণতা ক্রিয়াশীল রয়েছে। ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনের ভোগ-বিলাসের মধ্যেই তাদের জীবনের গন্ডি সীমাবদ্ধ বলা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনসহ জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাদের নৈতিক বা বৈষয়িক সমর্থন অত্যন্ত নেতিবাচক।

নাগরিক সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবীতে প্রতিবাদ সমাবেশ, মানববন্ধন, সেমিনার, কর্মশালা, সরকারের বিভিন্ন মহলসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লবি-ক্যাম্পেইন চালানো ইত্যাদি কর্মসূচীতে সামিল হতে দেখা যায়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের এই কার্যক্রম পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাদের মধ্যপন্থী চরিত্রের কারণে তাদের এই আন্দোলনমুখী কার্যক্রম মূলতঃ এ ধরনের নমনীয় কর্মসূচীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাদেরকে এর থেকে অধিকতর কঠোর কর্মসূচীতে সামিল হতে সচেতনভাবে বিরত থাকতে দেখা যায় বা সুকৌশলে এড়িয়ে যেতে দেখা যায়। এমনকি উল্লেখিত নমনীয় কর্মসূচীতে তাদেরকে লাগাতারভাবে বা আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে অবিচল মানসিকতা নিয়ে যুক্ত থাকতেও কম দেখা যায়।

বর্তমান দুনিয়ায় যে কোন সমাজে নাগরিক সমাজের ভূমিকাকে অস্বীকার বা অবহেলা করার কোন উপায় নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজকে অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নাগরিক সমাজের এমনিতর ভূমিকা ইতিহাসে প্রমাণ মেলে।

শেষ কথা

দেশে এখন সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, দলীয়করণ ও দুর্বৃত্তায়নের হীন তৎপরতা চরম আকার ধারণ

করেছে। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মুক্তি আসেনি। দেশের মাঝি-মাল্লা-কৃষক-শ্রমিক-মেথর-রিক্সা চালক-নিষিদ্ধ পল্লীর মা-বোনদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন আসেনি। এখনো পূর্বের মতো সমাজে শোষণ-নিপীড়ন প্রকট আকারে বিদ্যমান রয়েছে। শাসকগোষ্ঠী আগের মতো এখনো জুম্ম জনগণসহ দেশের অবহেলিত-উপেক্ষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভূমির অধিকার অস্বীকার করে চলেছে। দেশের সর্বত্র আদিবাসী জাতিসমূহের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে। তাদেরকে ভিটেমাটি থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা হচ্ছে এবং আদিবাসী জনগণের অস্তিত্ব নির্মূলীকরণের ষড়যন্ত্র জোরদার হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং এম এন লারমার প্রতিষ্ঠিত অধিকারকামী জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক দল পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পরও একের পর এক সরকার এই চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসি করে চলেছে।

আজ বিশ্বের দিকে দিকে আদিবাসীদের উপর শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সর্বাত্মক প্রয়াস শুরু হয়েছে। আদিবাসীর উপর শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও জাতিগত নির্মূলীকরণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশসহ বিশ্বের দেশে দেশে মানবতাবাদী ও বিবেকবান মানুষ আজ আদিবাসী জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি আদিবাসী জাতিসমূহের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সোচ্চার হয়েছে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহও আজ অধিকতর ঐক্যবদ্ধ এবং আগের যে কোন সময়ের তুলনায় তারা এখন অধিকতর সংগ্রামী হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাপী এই মহান কর্মপ্রয়াসে মহান নেতা এম এন লারমার বিপ্লবী সংগ্রাম ও অবদান নিঃসন্দেহে মুক্তিকামী মানুষের কাছে দিকদর্শন হিসেবে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা

সুদত্ত চাকমা

দেখতে দেখতে মহাজোট সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে জাতীয় নির্বাচনের সময় এসে গেল। এর সাথে আওয়ামীলীগ সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের নির্বাচনী ওয়াদা কেবল 'ওয়াদা' হয়েই থাকলো পরবর্তী নির্বাচনী প্রচারের জন্য। আর চুক্তির মৌলিক বিষয়াদি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে 'সরকার কালক্ষেপণ করে আসছে' মর্মে পার্বত্যবাসীর যে অভিযোগ তা আরও একবার সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো। প্রাক-নির্বাচন দিনের ঠিক এ সময়ে চুক্তি-সংক্রান্ত কোন কথা বলা মানে 'কাকস্য পরিবেদনা।' চাই কি ক্ষেত্র বিশেষে উপহাসের পাত্র হওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা। কেননা এখন দেশের ছোট-বড় তাবৎ শাসকগোষ্ঠী চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুযায়ী তাদের ভাষায় 'ক্ষমতায়' যাওয়ার জন্য 'স্বচ্ছন্দ পরিসর' নিশ্চিত করতে আদা-জল খেয়ে লেগে আছে। কারণ বিড়ালকে যে প্রথম প্রহরেই মারতে হবে! তাছাড়া ইত্যবসরে দেশজ গণতান্ত্রিক চর্চায় চরম সহিংসতা ভয়াবহ মাত্রায় বেড়ে গেছে। এই প্রকাশ্য নৈরাজ্যের ফায়দা তো নিতেই হয়! তাই প্রতিটি রাজনৈতিক চাল-এর কড়া-ক্রান্তি হিসেব-নিকেশ করা আবশ্যক বৈ কি। এর সাথে আরো জরুরী বিবেচ্য বিষয় যে, আন্তর্জাতিক মহলে কে কি বলছে বা কাকে কি বলে বাগে এনে প্রতিপক্ষকে জব্দ করা যায় এবং যথাসম্ভব ঐতিহ্য বজায় রেখে ব্যর্থতার গা-বাঁচানো ফিরিস্তি দিয়ে আপাতঃ নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বাকী সব চুলোয় যাক। এটাই তো এদেশের সিংহভাগ জাতীয় রাজনৈতিক দলের গণতান্ত্রিক চর্চার হাল হকিকত।

অপরপক্ষে আমরা? আমরা যারা জাতিগত, ধর্মীয় ও বিভিন্ন বিবেচনায় সংখ্যালঘু, যারা শাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে চির বহির্ভূত, যাদের কাছ থেকে কোনক্রমেই মতামত গ্রহণ নয় বরং জোর করে যাদের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয়, যারা সর্বক্ষেত্রে বহির্ভূত ও অনাহূত, যারা ঔপনিবেশিক কায়দায় শাসিত, শোষিত, বঞ্চিত ও তৎকারণে স্থায়ীভাবে পিছিয়ে পড়া, তারা কি করতে পারি? পারি কি হাল ছেড়ে দিতে? না, সেও তো হওয়ার নয়। কারণ আমরা যে হাল-এর সাথেই বাঁধা পড়ে আছি। তাই হতাশা, নিরাশা আর হা-পিত্যেসের সাথে আমাদেরকেও হিসেব কষতে হয় এবং আমরাও জাতি-সম্প্রদায়গতভাবে যে যার অবস্থান থেকে হিসেব কষে থাকি। তবে ফারাক এই, আমাদের হিসেব অবশ্যই সেই বহুল উচ্চারিত 'ক্ষমতায় যাওয়ার' হিসেব নয়। আমাদের হিসেব বরাবরই হয়ে থাকে আত্মরক্ষার হিসেব।

ঘটনাক্রমে জাতীয় জীবনের এই ক্রান্তিলগ্নে আবারো ঘুরে এসেছে ১০ই নভেম্বর। জুম্ম জাতির ইতিহাসে এটি 'কালোতম দিবস' হিসেবে চিহ্নিত। এই দিনে অন্ধকার রাতের শেষ প্রহরে 'ক্ষমতান্ধ, উচ্চাভিলাষী, অপরিণামদর্শী ও কুচক্রী মহলের ঘাতকদের' হাতে আটজন সহযোদ্ধাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাগরণের অগ্রদূত এম এন লারমা বর্বর হত্যাকান্ডের শিকার হন। চিরকালের জন্য হারিয়ে যান জুম্ম জাতির প্রাণপ্রিয় ভগীরথ যিনি তাঁর ভাষায় 'ঘুণেধরা ও ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত' সমাজে ঔপনিবেশিক যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুমূর্ষু জুম্ম জাতিকে সংগ্রামী গঙ্গায় অবগাহন করিয়ে আন্দোলনকে একটা শক্ত ভিটের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। আজ সমগ্র জুম্ম জাতি এই মহাত্মার স্মরণে নিজেদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে। কে জানে, দশা ভাণ্ডারে আর কি কি মজুদ আছে!

এম এন লারমা: এক অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

জুম্ম জাতির সর্বকালের অবিসংবাদিত নেতা এম এন লারমা প্রায়ঃশই আক্ষেপ করে বলতেন-'ব্রিটিশ শাসনামল, পাকিস্তান শাসনামল, বাংলাদেশ শাসনামল-কোন শাসনামলেই পার্বত্যবাসীদের স্বার্থ ও অধিকার যথাযথভাবে স্বীকৃত ও রক্ষিত হয়নি।' এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ১৬ বছর পরেও তাঁর এই খেদোক্তির যৌক্তিকতা এতটুকু ম্লান হয়ে যায়নি। মহান নেতা এম এন লারমার নেতৃত্বে সেদিনকার দুর্নিবার সংগ্রামী স্রোত এতটাই প্রবল ছিল যে, আদিবাসী জুম্ম নেতৃবৃন্দসহ খোদ আওয়ামী লীগের পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি চারু বিকাশ চাকমা, ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠানের সার্কেল চীফ বোমাং রাজা মং সুয়ে প্রু চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানাতে গিয়েছিলেন। এই ডেপুটেশনের জনৈক অংশগ্রহণকারীকে বলতে শুনেছি নিজেদের দলীয় জেলা নেতা চারু বিকাশ চাকমাকে দেখে বঙ্গবন্ধু নাকি যারপরনাই ক্ষেপে গিয়ে বলেছিলেন, "মি. চারু বিকাশ চাকমা, আপনি তো আমাদের লোক। আপনি কেন এনাদের সাথে এসেছেন? বলুন, আপনি কেমন ধারার স্বায়ত্তশাসন চান?" প্রত্যুত্তরে চারু বিকাশ চাকমা জানালেন যে, দলনেতাই সবায়ের পক্ষে বুঝিয়ে বলবেন।

এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বোমাং চীফ-এর দিকে তাঁর শাণিত বাক্যবাণ ছুঁড়ে বললেন, "মি. মংসুয়ে প্রু চৌধুরী, আপনি তো পাকিস্তান আমলে মিনিস্টার ছিলেন। বলুন, আপনার বান্দরবানের জন্যে আপনি কি করেছেন? এখন এসেছেন স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে। লজ্জা করে না? বলুন আপনার কি সেই স্বায়ত্তশাসন?" স্বাভাবিকভাবে বোমাং চীফ এধরনের রূঢ় কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এমনিতেই তিনি পরিশুদ্ধ বাংলা বলতে জানতেন না। রাগে, অপমানে তাঁর দুধে-আলতায় মেশানো রংয়ের মুখমণ্ডল টমেটোর মতো লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'Honorable Prime Minister, kindly note that since our team leader is here, I am not the right person to say about the demand. Mr.

Larma will explain what the autonomy is'। এরপর তিনি এম এন লারমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'Mr. Larma, please explain what the autonomy is all about'।

এই একাংশ কথোপকথনের মধ্যে তৎকালীন সরকার ও জুম্ম নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার অধিকার-সংক্রান্ত আলোচনার পরিবেশ কেমন ছিল তা' সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। প্রয়াত নেতা এম এন লারমা 'সংবিধান প্রণয়ন কমিটি'র কাছে ৪ দফা-সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। সেই ঐতিহাসিক ৪ দফা দাবি হল-

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হবে এবং ইহার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২. উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য "১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধির" ন্যায় অনুরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

৩. উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, সেইরূপ সংবিধিব্যবস্থা শাসনতন্ত্রে থাকবে।

পার্বত্যাঞ্চলের একমাত্র সাংসদ এম এন লারমা তথা জুম্ম জনগণের প্রাণের দাবি বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়ে তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখান করে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশ্নে 'দমনমূলক' নীতি গ্রহণ করে। দেখা গেল হুমকি-ধামকির মুখে জুম্মদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত নেতৃবৃন্দ এবং উদীয়মান সামন্ত বুর্জোয়াগোষ্ঠী যথারীতি শ্রেণী চরিত্র অনুযায়ী ভড়কে যায় এবং একপর্যায়ে তারা সরকারি দালালীপনার মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীলগোষ্ঠী হিসেবে আন্দোলনের বিপক্ষে অবস্থান নেয়।

এম এন লারমার রাজনৈতিক রণকৌশল

৭ই জুন ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক পার্টি মিলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল) গঠিত হয় এবং সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হলে তিনি বাকশাল গঠন করেন (অনুচ্ছেদ ১১৭এ) এবং বাকশাল-ই একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে স্বীকৃত হলে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ইতিমধ্যে এম এন লারমার নেতৃত্বে পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি উদ্ভূত পরিস্থিতির উপর দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর রণকৌশল নির্ধারণ করে। এ রণকৌশল অনুযায়ী জনসংহতি সমিতি বাকশাল পার্টিতে যোগদান করে, যার ফলে সম্ভাব্য সরকারী দমন কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায় বলে জানা যায়। এম এন লারমা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আন্দোলন জারী রাখেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের সময় একদল বিপথগামী বিদ্রোহী সেনাদলের হাতে নির্মমভাবে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারী হয়। বিচারপতি এ এস সায়েম রাষ্ট্রপতি হন। ১৯ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে ৬৭ জনের এক প্রতিনিধিদল রাষ্ট্রপতির কাছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। পরে ১৯৭৬ সালে প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের কাছেও অনুরূপ দাবিসহ স্মারকলিপি পেশ করা হয়। জেনারেল জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে একটা 'অর্থনৈতিক সমস্যা' হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং আন্দোলন দমনের জন্য সামরিক সমাধানের পথ বেছে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক অভিযান শুরু করেন।

এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জনসংহতি সমিতি গোপন রাজনীতির পথে চলে যায় এবং পরিণতিতে সশস্ত্র আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ফলে সামরিক সরকার পার্বত্য জুম্মদের উপর এক অসম ও অঘোষিত যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এভাবে পার্বত্য আদিবাসীদের যে দাবি একসময় গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে আবদ্ধ ছিল পরে সে দাবির মাধ্যম হয়ে ওঠে অস্ত্রের ভাষা। দীর্ঘ ৯ বছরের যুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের অভাবনীয়, অপরিমেয় ও অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এম এন লারমার বিজ্ঞ পরিচালনায় আন্দেলনে এতটুকু ভাটা পড়েনি। বরং দেখা গেল যে, যুদ্ধ পরিস্থিতি সত্ত্বেও জনসংহতি সমিতির সাথে আলোচনার জন্য সামরিক সরকারের পক্ষে পরিবেশ সৃষ্টির একটা প্রয়াস ছিল।

ইস্পাত-কঠিন ঐক্য: মহান শিক্ষক এম এন লারমার শিক্ষা

অধিকার আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মধ্যেকার ঐক্য গঠন সম্পর্কে তিনি 'ইস্পাত-কঠিন' শব্দ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে ঐক্যের স্বরূপ বোঝাতেন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে জোরালো অভিমত ব্যক্ত করতেন। বৃহত্তর জুম্ম জাতীয় ঐক্য গঠনে তাঁর এ অনুভূতি মূল সংগঠন ও অঙ্গসংগঠনসমূহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবহমান ছিল। সাধারণভাবে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব, চিন্তার জগতে সামন্ত ও ক্ষুদে উৎপাদকের শ্রেণী-দর্শন এবং উদীয়মান সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছাড়াও জাতিগোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্যতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে জগদ্দল পাথরের মতো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই দুর্বল ফাঁক-ফোকড় দিয়ে বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর সরকারসমূহ জুম্মদের মধ্যেকার গড়ে ওঠা 'ইস্পাত-কঠিন' ঐক্যে সনাতনী ঔপনিবেশিক কায়দায় ফাটল ধরিয়ে তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের বৃথা চেষ্টা চালায়।

মহান নেতা এম এন লারমার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির কর্মকৌশল ছিল- একদিকে জুম্ম জাতীয় ঐক্য ধরে রাখা এবং অন্যদিকে বিভিন্ন জাতিসত্তা যেন আন্দোলন দমন-জনিত সরকারী কূটকৌশলের দ্বারা অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাও লক্ষ্য রাখা। এতে করে দেখা গেল যে, আখেরে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। শিক্ষার হার বেড়েছে, তাদের মধ্যে বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ বেড়েছে এবং তারা আরো বেশী সুকৌশলী হয়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা প্রায় আড়াই দশককাল ধরে যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে চাক্ষুস করেছে এবং করছে লক্ষ লক্ষ বেআইনী বহিরাগত পুনর্বাসন, ভূমি ও গ্রাম জবরদখল, সরকারী অধিগ্রহণের নামে ভূমিদখল, বেআইনী ভূমি লীজ প্রদান, ব্যাপক গণহত্যা, জাতিগত দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ, ধর্ষণ, নারী ও শিশু হত্যা, নারী অপহরণ, ধর্মীয় উপাসনালয়ে পৈশাচিক তান্ডবতা, ধর্মান্তরকরণ ইত্যাদি নারকীয় নৃশংসতা। দেশে নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত থাকলেও কোন সরকারকে ঔপনিবেশিক কায়দায় পরিচালিত এহেন অমানবিক

ও পৈশাচিক আচরণের জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ প্রদর্শন করতে দেখা যায়নি। এসব সত্ত্বেও জুম্ম জনগণের মধ্যেকার ঐক্য যেন ক্রমশঃ ইস্পাত-কঠিন রূপ ধারণ করছে।

এম এন লারমার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীগত অবস্থান

আমরা জানি, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজন এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়-এর মধ্যে ইতিহাসের একটা নাড়ীর সম্পর্ক আছে। এম এন লারমা এর সুন্দর দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা দিতেন। তাঁর দৃষ্টিতে দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় তখনো জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে ওঠেনি। পাকিস্তান জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ছত্রছায়ায় কেবল কম্প্রাডর বুর্জোয়া (Comprador class) বা মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। সেসময়ে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক দলগুলো মূলতঃ দেশীয় সামন্ত ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীরই প্রতিনিধিত্ব করতো এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তাঁবেদারী করতো। তবে পাকিস্তানী জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে তাদের স্বার্থগত দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত বিকাশের কারণে তারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাদের সক্রিয় সমর্থন ছিল। স্বাধীন দেশ হওয়া মানে নিজেরাই সব সম্পত্তির তথা দেশের প্রভূ হওয়া। সামন্ত বুর্জোয়া ও মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণীর শ্রেণীগত চরিত্র সম্পর্কে প্রয়াত নেতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন, 'এ শ্রেণীগুলো চারিত্রিক দিক থেকে দুর্বল, চরম প্রতিক্রিয়াশীল এবং দেশপ্রেম বিবর্জিত। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মতো এরা দেশপ্রেমিক নয়। জাতীয় বুর্জোয়ারা প্রয়োজনে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান কিংবা অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কেননা তাঁরা আধুনিক গণতন্ত্রের জনক এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর তাঁরাই আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের (নেশন স্টেট) প্রতিষ্ঠাতা।

পূর্ববাংলা স্বাধীন পাকিস্তানের একাংশ, উপনিবেশ, আধা-উপনিবেশ, সামন্ততান্ত্রিক বা আধা-সামন্ততান্ত্রিক কিনা সেটা অবশ্য এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এ নিয়ে বাম রাজনীতিতে যে বিভাজন ও রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে সেটা একটা রীতিমত দুঃখজনক ইতিহাস। এখানে আলোচ্য বিষয় হলো-বাংলাদেশে দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বিকাশ ঘটেছে কিনা। দেশে শিল্প-কারখানার বিকাশ, জাতীয় রাজনীতির বিকাশের ধারা, রাজনৈতিক দর্শন, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক চর্চা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশক বিচারে বাংলাদেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে-একথা হলফ করে বলা যায় না। এ দেশের সেনাবাহিনী একটা 'ডি ফ্যাক্টো' ক্ষমতাসম্পন্ন রাজনৈতিক দল যা আভ্যন্তরীণভাবে অনেকটা সার্বভৌম। এ বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে কোন সরকার বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম-সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। সর্বোপরি এদেশের রাজনৈতিক গণমানসে রয়েছে ১৯৪৭ ও ১৯৭১-এর চেতনার টনটনে বৈপরীত্য, যা সমগ্র দেশবাসীকে দুটো পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছে। প্রথমোক্ত চেতনায় রয়েছে ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্ব আর দ্বিতীয়টাতে রয়েছে জাতি-ভিত্তিক চেতনা, যা পরবর্তীতে উগ্র জাত্যাভিমানে বিকশিত। সামগ্রিক বিকাশের পথে এটাও যেন একটা জগদ্দল পাথর। প্রতিটি ক্ষেত্রে এ দু'শিবিরের মধ্যেকার চূড়ান্ত রূপ অনিবার্যতার সাথে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীতে উত্তরণের 'পাইপ লাইনে' যারা আছে তারা এই দুই বৈপরিত্যের প্রতিভূ। সুতরাং এ পর্যায়ে দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়ার ইতিবাচক দিক বলতে যা বোঝায় এক্ষণে এই শ্রেণীর কাছে প্রত্যাশা করা বাতুলতা মাত্র।

শাসকশ্রেণী ও তথাকথিত রাজনৈতিক মূলধারায় স্রোতায়ন

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে অবমূল্যায়ন ও অপমূল্যায়ন করা হতো বলে একসময় জাতীয় রাজনৈতিক সমাজে একটা অভিযোগ শোনা যেতো। তাঁরা পার্বত্যবাসীদের বলতেন-'তোমরা আঞ্চলিক রাজনীতি ছেড়ে মূল জাতীয় রাজনৈতিক ধারায় চলে এসো।' অর্থাৎ আঞ্চলিক রাজনীতি ছেড়ে জাতীয় রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়ার কথা বলা হতো। পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মধ্য থেকে জাতীয় রাজনীতিতে কেহ যুক্ত ছিল না এমন নয়। অনেকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারার সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ তখনকার শিক্ষক ও ছাত্রসমাজের একটা বিরাট অংশ বাম রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তবে কিছু সুবিধাবাদী অংশ ক্ষমতাসীন দক্ষিণপন্থী রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল যাদেরকে জুম্ম সমাজ ঘৃণার চোখে দেখতো। সাম্প্রতিক সময়ে জুম্মদের মধ্যে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। দক্ষিণপন্থী জাতীয় রাজনীতিতে জুম্মদের এই অংশগ্রহণের পেছনে কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ বা উদ্দেশ্য কাজ করে নি। এতে ছিল নির্ভেজাল অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সংশ্লিষ্ট দলের দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থগত স্বয়ংক্রিয় বোঝাপড়া। পার্বত্য জেলা পরিষদগুলো আজও অন্তর্বর্তীকালীন থেকে যাওয়ায় এবং সেখানে কেবল ক্ষমতাসীন দল পালাক্রমে সদস্য নির্বাচন করতে থাকার সুবাদে এক শ্রেণীর জুম্ম গজিয়ে ওঠে যারা শাসকগোষ্ঠী প্রবর্তিত 'টন-মন'-এর রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার বিষয়ে তারা শাসকশ্রেণীর ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। এমনকি ক্ষমতার অবস্থান-বিশেষে কেহ কেহ এমন জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী ভূমিকা রাখে তা দেখে নিজেদের দলীয় লোক বলে স্বয়ং শাসকশ্রেণীও মহাফাঁপড়ে পড়ে যায়। শাসকশ্রেণীর মতো তারাও তাদের অপকর্মের জন্য আদৌ লজ্জিত বা কুণ্ঠিতবোধ করে না। তবে দালালীপনার যোগ্যতায় কিছুটা প্রভাব রাখলেও তাদেরকে জনগোষ্ঠীর মূলস্রোত থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ধরা যায়। কেননা মূল জনগোষ্ঠী রুক্ষ, কঠোর ও নির্মম বাস্তবতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত ও নিষ্পেষিত বলে তাদের কাছে কিন্তু শাসকদলের উন্নয়ন-ফিরিস্তি রীতিমতো গদ্যময় ঠেকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা মহোদয়কে একবার এক হেডম্যান সম্মেলনে প্রশ্ন রাখতে দেখা গেছে। আদিবাসী ঐতিহ্যগত প্রতিষ্ঠান হিসেবে হেডম্যান ও কার্বারীদের প্রতি প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন-"যে দল আপনাদের ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দেয় না, এমনকি আপনাদের অস্তিত্বই স্বীকার করে না, সে দল করে কি লাভ?" চেয়ারম্যান মহোদয়ের এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাদের কাছে থাকারও কথা নয়। স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার লোভে তারা যে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী রাজনৈতিক দলগুলোতে যোগদান

করছে তাতে করে তারা একদিকে জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলছে, অন্যদিকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই আত্মঘাতি ধারা থেকে তাদের অচিরেই সরে আসা উচিত। জাতীয় রাজনীতির সাথে জুম্মদের অবশ্যই ভূমিকা থাকতে হবে। তবে তা হতে হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসেবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বনাম বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী

আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তথা এ গোলার্ধের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের বিশেষ অবস্থায় ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের একমাত্র সংগ্রামী রাজনৈতিক সংগঠন জনসংহতি সমিতির সাথে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকারের মধ্যে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭' স্বাক্ষরিত হলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবিতে দুই দশক কাল ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হয়। আন্তর্জাতিক মহল এ চুক্তিকে স্বাগত জানালেও জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলো এ চুক্তির প্রশ্নে ঐক্যমত প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়। দেশের অন্যতম প্রধান দল বিএনপি রীতিমত কালো ব্যাজ ধারণ করে এ চুক্তির বিরুদ্ধে 'লং মার্চ' করে। জেনারেল থেকে রাজনৈতিক নেতা হওয়া এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টি পার্বত্য চুক্তির ব্যাপারে আজও দলীয় অবস্থান পরিষ্কার করেনি। আর ধর্মভিত্তিক দলগুলোর কথা তো অবান্তর। পাকিস্তান আমলে মুসলিম লীগ (যার এখন অস্তিত্ব নেই) ও জামায়াতে ইসলাম তৎকালীন শাসকদল হিসেবে ছিল। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম রেগুলেশনে তারাই প্রথম কাঁচি চালিয়ে ভারত থেকে পাকিস্তানে আশ্রিত হাজার হাজার মুসলিম পরিবারকে নাইক্ষ্যংছড়ি, লামা, নানিয়ারচর ও লংগদু উপজেলায় বেআইনীভাবে পুনর্বাসন করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম লীগাররা নাম পাল্টে নতুন মোড়কে জাতীয় রাজনীতিতে দাপটের সাথে বিরাজ করছে তা বলার দরকার পড়ে না। অন্ততঃ এমনই একজন এককালের দশাসই মুসলিম লীগার তথা হালের বিএনপি নেতা সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরীর কথা না বললেই নয়। কেননা চট্টগ্রামের এই চৌধুরী পরিবার কমপক্ষে দু'জেনারেশন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আদিবাসী জুম্ম উৎখাতের মূল উদ্যোক্তা বলে পরিচিহ্নিত হয়ে আছে।

ক্ষমতাসীন মহাজোট সরকারের জোরালো দাবি যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সিংহভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে। অপরদিকে চুক্তি স্বাক্ষরকারী অপরপক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির বক্তব্য হলো, সরকার এখনো চুক্তির মৌলিক দিকগুলো বাস্তবায়ন করেনি। মৌলিক দিকগুলোর মধ্যে অস্থায়ী সেনাক্যাম্প প্রত্যাহার, ভূমি সমস্যার নিষ্পত্তি, ভারত-প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব জমিতে পুনর্বাসন, বেআইনী বসতিকারী বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে পুনর্বাসন-এর মতো বিষয়গুলো আজও স্পর্শ করা হয়নি। এছাড়া পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচনসহ আইন-শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, স্থানীয় পুলিশ, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, বন ও পরিবেশ, মাধ্যমিক শিক্ষা, জুম চাষ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করেনি। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে চুক্তি অনুযায়ী আইন প্রণয়নসহ পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠিত হয়েছে। তবে প্রণীত আইনসমূহ কার্যকর করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি এবং এযাবৎ পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় আজও অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ বহাল আছে। পরিষদের আইন কার্যকর করতে হলে প্রচলিত আইনসমূহের সাথে যে সাংঘর্ষিক দিক রয়েছে সেগুলোর সংশোধন এবং সেই সাথে যে সকল প্রবিধানমালা প্রণয়নের দরকার সে বিষয়ে কোন সরকারের উদ্যোগ দেখা যায়নি। ফলে পরিষদসমূহ কার্যতঃ অকার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক আজও ৩৩টি বিষয়ের সবগুলো পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তর করা হয় নি। পরিষদসমূহ অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। পরিষদগুলো কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকারি নির্দেশনামা না থাকা, প্রবিধানমালা প্রণীত না হওয়া এবং পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের সাবেকী জনবল কাঠামোর পরিবর্তন না করা ইত্যাদি কারণে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে সাধারণ এনজিও পর্যায়ে ফেলে রাখা হয়েছে। অথচ এই পরিষদগুলোতে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এই টাকার সুবিধাভোগীরা কারা? দলীয় মনোনয়নে চেয়ারম্যান ও সদস্য মনোনীত করে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা একটা প্রথায় পরিণত করা হয়েছে। যেই দল ক্ষমতাসীন হয় সেদলেরই মনোনয়নে পরিষদ গঠিত হয়। এতে ক্ষমতাসীন দলের লোকজনই সরকারী বরাদ্দের সুবিধাভোগী হয়ে থাকে। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সুবিধাভোগী তারাই। আর বাকীদের নিয়ে রমরমা চাকুরী বাণিজ্য চলে। এভাবে কালক্রমে পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করা হয়েছে। অতএব পার্বত্য চুক্তির সুবিধাভোগী সব সময় ক্ষমতাসীন দলের লোকজনরাই হয়ে থাকে, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীরা নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের উৎখাত করার মেকানিজমের আর এক কলঙ্ক হলো-'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড।' এ বোর্ডেরও একটা ইতিহাস আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলন দমন অভিযানকে "অপারেশন দাবানল" থেকে "অপারেশন উত্তরণ" পর্যন্ত দু'টো প্রেক্ষিত-এ দেখা যেতে পারে। জেনারেল জিয়া "অপারেশন দাবানল" ঘোষণা দিয়ে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীগত সংখ্যালঘু নিধন ও উচ্ছেদ এবং বহিরাগতদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরে ২০০১ সালে তার পরিবর্তে "অপারেশন উত্তরণ" নামে ভিন্নরূপে পুনর্বহাল করা হয়। স্মর্তব্য যে, জেনারেল জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার পর পরই 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬' জারী করেন এবং তদনুযায়ী 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড' গঠিত হয়। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হতেন চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন দলেরই কোন এক এমপি উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে বহাল হন এবং পূর্ববৎ তাঁর মাধ্যমে সরকারের

সামরিক-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণে উন্নয়ন বোর্ড-এর ভূমিকা বজায় রাখা হয়। এখন বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা এরশাদ শাসনামলে 'রাজনৈতিক সমস্যা' বলে স্বীকৃত হয়েছিল এবং অতঃপর ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার রাজনৈতিক সমাধান হিসেবে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর ও চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় ছিল এবং বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলেও প্রক্রিয়াধীন আছে, সর্বোপরি পার্বত্য চুক্তিতে এই বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে বলে বিধান রয়েছে, সেহেতু এই উন্নয়ন বোর্ড স্বতন্ত্রভাবে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। হয় এই বোর্ডকে বিলুপ্ত করতে হবে, না হয় সরাসরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদে হস্তান্তর করতে হয়, যার কোনটাই কোন সরকার করেনি। অধিকন্তু মহাজোট সরকার উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স-এর পরিবর্তে একটি খসড়া আইন গত ২৮ অক্টোবর ২০১৩ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করে। এখানেই অপারেশন উত্তরণ-এর সাথে উন্নয়ন বোর্ড-এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আজও বজায় রাখার অজুহাত নিহিত রয়েছে।

পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের ১৬ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও চুক্তির মৌলিক দিকগুলোর বাস্তবায়ন করা হয়নি। চুক্তি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা ছাড়াও আওয়ামী লীগ চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়টা নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করে সদিচ্ছার যে বহিঃপ্রকাশ প্রদর্শন করেছিল সরকারে এসে তা স্পর্শও করে দেখেনি। এমনকি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পেশকৃত ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনী-সংক্রান্ত সুপারিশমালা যথাযথ প্রক্রিয়ায় সরকার ও আঞ্চলিক পরিষদ উভয় পক্ষের মধ্যে গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ৩টা পয়েন্ট বাদ দিয়ে এবং অন্য দু'টি পয়েন্টের বয়ানে একতরফা রদবদল করে অনর্থ ঘটিয়েছে। ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে দিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে চুক্তি ও আইন বিরোধী অপপ্রয়াস চালিয়েছে। চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নে কার্যতঃ চুক্তিবিরোধী অপকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে মহাজোট সরকার সদিচ্ছার চরম দৈন্যতা দেখিয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে পার্বত্য চুক্তির সাংবিধানিক নিশ্চয়তার পরিবর্তে উগ্র বাঙালি জাত্যাভিমান ও মৌলবাদের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা পাকাপোক্ত করেছে।

'অপারেশন উত্তরণ' প্রয়োগ-উত্তরকালের এই দীর্ঘ দেড় যুগের পথ পরিক্রমায় দেখা যায় যে, উঠতি জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার চরিত্র ত্যাগ করতে পারেনি, অনুরূপ তাদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি জাতীয় রাজনৈতিক সমাজও তাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এখনও সামন্ততান্ত্রিক দর্শন থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সে কারণে তারা সব বিষয়ে সবসময় পরমুখাপেক্ষী। গণতান্ত্রিক চর্চায় সহিংসতা আমদানীতে তারা কুণ্ঠিত নয়। নিজেদের কৃতকর্মের সার্টিফিকেট চায় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের কাছে। নিজেদের দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিধান করতে বিদেশীদের মাতব্বরী প্রশ্রয় দিতে তাঁদের বাধে না। ফরমাল পোশাক পরে মন্ত্রী পদমর্যাদায় আন্তর্জাতিক শ্রম-বাজারে ঘোরাফেরা করা এবং আব্রু ছেড়ে ঘরের মা-বোনদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে শ্রম বিক্রির ব্যবস্থা করতে তাঁরা লজ্জাবোধ করেন না। অন্যতম প্রধান জাতীয় সমস্যা জনসংখ্যার বিস্ফোরণে তাঁরা আদৌ উৎকণ্ঠিত নন বরং তাঁরা এর সমাধান খোঁজেন দেশে ভূমির জবরদখল ও বিশ্বব্যাপী অনুপ্রবেশ ঘটানোর মাধ্যমে। দেশের বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, মিডিয়া স্বাধীনতা এবং সরকারের প্রতি ও সংবিধানের প্রতি সেনাবাহিনীর সদা আনুগত্য বিধানে ব্যর্থতায় এনাদের কিছুই যায় আসে না। এমনই এক শাসকশ্রেণী যাঁরা প্রতিবারেই নির্বাচনে বিধিবহির্ভূত বিপুল অর্থব্যয়, অপরিমেয় জাতীয় সম্পদের ক্ষতি ও শত শত তাজা প্রাণের বিনিময়ে পালাক্রমে দেশের শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে থাকেন। এ রাজনৈতিক ধারাকে তাঁরা গণতন্ত্র চর্চার ঐতিহ্য ও প্রথা করে রেখেছেন। দেশের শাসকশ্রেণী তথা 'সিভিক পলিটি' বা রাজনৈতিক সমাজ যাঁরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করে থাকেন, বাংলাদেশকে একটা যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার পক্ষে তাঁরা নিজেরাই প্রধান অন্তরায় নন কি? কাজেই পার্বত্য চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা কতটুকু ভরসাস্থল হয়ে থাকতে পারেন এটা প্রশ্নবিদ্ধ থেকে যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন=বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক উত্তরণ

আমরা লক্ষ্য করে আসছি যে, পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে চুক্তি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে জনসংহতি সমিতি লাগাতার দেন-দরবার করে আসছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় দিক হলো-খোদ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দলীয় সরকারের পক্ষ থেকেও কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং সরকার অগ্রণী ভূমিকা রাখার পরিবর্তে শুরু থেকেই নানা ছল-চাতুরীর আশ্রয়ে চুক্তির মৌলিক দিকসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করার প্রক্রিয়া ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। এমনকি বিভিন্ন মহলের প্রকাশ্য চুক্তিবিরোধী অপতৎপরতার বিরুদ্ধেও এ যাবৎ কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ইতিমধ্যে সরকার আবার 'আদিবাসী ভূত' দেখেছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার 'আদিবাসী ও ট্রাইবাল কনভেনশন নং ১০৭' অনুস্বাক্ষর করেন। আদিবাসীরা না চাইলেও বিভিন্ন আইন, রাষ্ট্রীয় লিটারেচার ও আচার-অনুষ্ঠানে সরকার জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে বোঝাতে 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার করে এসেছে। কিন্তু যেই জুম্মরা নিজেদেরকে আদিবাসী পরিচয়ে তুলে ধরতে আগ্রহী হয়েছে, অমনি সরকার আদিবাসী শব্দ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। অথচ বিশ্বব্যাপী ইংরেজী 'ইন্ডিজিনাস পিপলস'-এর বঙ্গানুবাদ 'আদিবাসী' শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এক্ষণে সরকার কোনভাবেই তা গ্রহণ করতে রাজী নয়। এর কারণ কি? এবার চুক্তিবিরোধী শিবিরের সাথে সুর মিলিয়ে সরকার বলে যে, জুম্মরা আর যা-ই হোক, অন্ততঃ এরা এদেশে আদিবাসী নয়। শুধু তারা কেন এদেশে আদিবাসী বলতে কেহ নেই এবং যদি থেকে থাকে তাহলে কেবল বাঙালিরা-ই এদেশের আদিবাসী বা 'আদিম অধিবাসী।' অতএব এবার প্রণীত বিভিন্ন আইন ও পলিসী দলিল থেকে আদিবাসী শব্দের বিলুপ্তি করার তোড়জোর প্রক্রিয়া শুরু। অবশ্য তদস্থলে কি লেখা যায় তা নিয়ে যেন কোন সন্দেহ না থাকে আর অভিন্নতাও যেন রক্ষিত হয় সেজন্যে সংবিধানের

পঞ্চদশ সংশোধনীতে দেশের ৫৪টি আদিবাসী জাতিসমূহকে চিহ্নিত করতে নিম্নোক্ত বহুল-বিতর্কিত সংশোধনী আনা হয়েছে-

"৬। নাগরিকত্ব।- (২) বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালি এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন। ২৩ (ক)। উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি।- রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

এখানে 'জনগণ' আর 'নাগরিকগণ' কারা কারা? দেশের জনগণ ও নাগরিকগণের মধ্যেকার পার্থক্য কি? মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ ধরনের স্বতন্ত্র প্রয়োগের রেওয়াজ কোথাও আছে কি? এই শব্দাবলীর সংজ্ঞা-ই বা কি? এসব প্রশ্নাবলী দেশের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদগণ বিবেচনা করবেন। তবে এ সংশোধনীতে সন্তুষ্টি লাভের বিষয় হলো- বাংলাদেশে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আছে তা এই প্রথমবার ভিন্ন আঙ্গিকে সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে। এটা সত্য হলেও সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ কারা তা সংজ্ঞায়িত করা হয়নি আর কেবল 'সংস্কৃতি সংরক্ষণ' ছাড়া তাদের সুরক্ষা ও বিকাশের জন্য কি কি মৌলিক অধিকারের উপর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থাকবে তা কিন্তু বলা হয় নি।

প্রয়াত নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার যথাযথ সমাধানের সূত্র হিসেবে স্বতন্ত্র আইন পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছিলেন এবং এর সংবিধানিক গ্যারান্টির কথাও বলেছিলেন। মূলতঃ তাঁর প্রস্তাবিত এই সূত্র ধরে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার আলোচনার এক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি বাস্তবায়নের শুরুর দিকে (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং (৩) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য এক বিশেষ শাসন কাঠামো প্রবর্তিত হয়। এটা এক ধরনের স্বশাসন ব্যবস্থা বলা যেতে পারে বটে। তবে এম এন লারমা প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র আইন পরিষদ-সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা নয়। এম এন লারমা প্রস্তাবিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে সরকার পক্ষের অন্যতম যুক্তি ছিল সাংবিধানিক বাধা এবং এককেন্দ্রীক সরকার যে জন্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ অসম্ভব। তাছাড়া সংসদে সরকারের নিরঙ্কুশ সংখ্যারিষ্ঠতা নেই। উপস্থাপিত যুক্তি ও বিরাজমান বাস্তবতার প্রতি জনসংহতি সমিতির সহমত থাকায় চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। তবে এখনকার বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো। সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বে এবং চুক্তি বাস্তবায়নে দেশের নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক মহলের সহযোগিতার প্রবল আনুকূল্য সত্ত্বেও মহাজোট সরকার চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নে দৃশ্যতঃ দ্বিধাগ্রস্ত যা জনসংহতি সমিতির বিবেচনায় 'সদিচ্ছা'র অভাব বলা হয়ে থাকে। কেন এই দ্বিধা? দেশের রাজনৈতিক সমাজ বলবেন কি?

অতএব একবিংশ শতকের এই দিনে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের প্রশ্নে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠীকে ঠিক করতে হবে যে, তাঁরা কোন পথে এগোবেন। তাঁরা কি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অনুসৃত বর্বরতার পথ অনুসরণ করবেন নাকি সভ্যজগতের গণতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করবেন? তাঁরা কি অতীতের ভুল শুধরিয়ে পার্বত্য চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করবেন নাকি 'অপারেশন দাবানলে' আদিবাসী জুম্মদের পুড়িয়ে মারবেন?

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মরা মনে করি, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এবং আশা করি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী নিজেদের শ্রেণীগত অবস্থান উন্নীত করবেন, উগ্র ধমান্ধতা ও উগ্র-জাত্যাভিমান ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি অনুকরণীয় জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপদান করতে এগিয়ে আসবেন।

এম এন লারমার আদর্শ কখনও ধ্বংস হতে পারে না

বাচ্চু চাকমা

শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্যহীন ও শোষণমুক্ত সমাজ গড়া, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা-এসবই ছিল একজন সংগ্রামী মানুষের লালিত স্বপ্ন। সাধারণের মাঝে অসাধারণ হিসেবে অনেক কন্টকাকীর্ণ পথে চলেছেন আজীবন-আমৃত্যু পর্যন্ত। একজন মানুষ কতটা ত্যাগী ও মহান হলে এসব করতে পারেন তার উদাহরণ তিনি প্রতিটি মুহূর্তে দিয়ে গেছেন। ৩০তম মৃত্যু দিবসে আজ গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এ পর্যন্ত যারা শহীদ হয়েছেন, স্মরণ করছি মহান নেতার সাথে ৮ জন শহীদ সংগ্রামী সহযোদ্ধা বন্ধুদের।

মহান নেতা সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে এক মুহূর্ত পর্যন্ত থমকে দাঁড়ান নি। যেখানে প্রতিবাদ করা প্রয়োজন, যেখানে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন, সেখানে তিনি সাহসের সাথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এভাবে আমরা দেখতে পাই, তিনি নিজেকে জুম্ম জাতির পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। হাজারো বিপর্যয়ের মধ্যেও তিনি কখনো কোনদিন রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছে হতাশ হয়ে হার মানেননি। তিনি ছিলেন সত্যিকারের মহান বিপ্লবী নেতা, জুম্ম জনগণের পরম বন্ধু, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির দিশারী। তিনি সর্বদাই আপোষহীন, সত্য ও ন্যায়ের অতন্দ্র প্রহরী। তিনি ছিলেন জুম্ম জাতির অকুতোভয় বীর সেনানী। এভাবে তিনি একজন সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ ও মহামানব হিসেবে বিশ্বে আবির্ভূত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো-কে এই মানুষটি?

এক নামে আমরা সকলেই তাকে চিনি। তিনি জুম্ম জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা, জুম্ম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার আদায়ের আন্দোলনের অগ্রদূত, দুনিয়ার সকল নিপীড়িত মানুষের বন্ধু "মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা"। আজ শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে নয়, সারা বাংলাদেশের মানুষ স্বীকার করবেন এম এন লারমা একটি মহান আদর্শের প্রতীক, একটি সংগ্রামী নাম ও প্রতিবাদের বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর। এখন প্রশ্ন হলো, কোন পরিস্থিতি তাকে সংগ্রামে উজ্জীবিত করেছিল। আমরা বর্তমান যারা ছাত্র ও যুব সমাজ আমরা দেখিনি কিভাবে পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে একটি জনপদ, একটি সমাজ ও সভ্যতা। কিভাবে কাপ্তাই বাঁধের ফলে পানির গভীরতায় হারিয়ে যেতে পারে মানুষের বাঁচার স্বপ্ন। কিভাবে পানির অতল গভীরে হারিয়ে যেতে পারে ৫৪ হাজার একর ধান্য জমি, কিভাবে হারিয়ে যেতে পারে মানুষের বাগান-বাগিচা ও বসতভিটা, কিভাবে উদ্বাস্তু হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে পারে এক লক্ষের অধিক অসহায় জুম্ম জনগণ। আমরা আজ এসব ইতিহাসে পড়ি, কখন বা দাদু-দাদীর কাছে আর্তনাদে ভরা গল্প শুনি। প্রয়াত নেতা এম এন লারমা ছিলেন কাপ্তাই বাঁধের প্রত্যক্ষদর্শী। পাকিস্তান আমলে কাপ্তাই বাঁধের ফলে পানির তলে নিমজ্জিত অনেক পাহাড়ী গ্রাম ডুবে যেতে দেখেছেন। অগণিত অসহায় মানুষের চোখে অবিরাম অশ্রু, হাজার হাজার জুম্ম জনগণের বাঁচার স্বপ্নভঙ্গের আহাজারী দেখেছেন। এই হতাশা-বঞ্চনা, গ্লানির মর্মবেদনা, পরিহাসের কথা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার দালালীপনাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেছেন। রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রবল চোখ রাঙানি উপেক্ষা করেও প্রতিবাদ করেছেন নির্ভয়ে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেও তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামী চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।

আমরা সকলেই জানি তিনি স্বপ্ন দেখেছেন একটি সুন্দর আবাসভূমির। খুব ভালবেসে তাঁর নাম দিয়েছেন "জুম্মল্যান্ড"। সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে হেঁটেছেন এই সুন্দর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য। তিনি জানতেন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। ডাক দিলেন জুম্ম জনগণকে, আহ্বান জানালেন তাঁর স্বপ্নের "জুম্মল্যান্ড" প্রতিষ্ঠা করতে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ জুম্ম জনগণের কাছে গেছেন এই মহৎ দর্শন নিয়ে যা জুম্ম জাতীয়তাবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এই জুম্ম জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করতে জুম্ম জনগণকে নিয়ে গড়ে তুলেছেন তার পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। তাঁর প্রতিটি কর্মী-বন্ধুদের কাছে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন-"সংগ্রাম ব্যতীত কোন জাতি বাঁচার অধিকার রাখে না"। যতই দিন গড়িয়েছে ততই মহান নেতার উক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

মহান নেতা এম এন লারমা শুধুমাত্র জুম্ম জনগণের বন্ধু নন, বরং সমগ্র দুনিয়ার নিপীড়িত মানুষেরই বন্ধু বটে। মহান সংসদে তাঁর ভাষণে উঠে এসেছে শ্রমিক-দিনমজুর-নারীসহ সকল মানুষের অধিকারের কথা। তিনি তাঁর প্রজ্ঞা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে ভূখন্ডকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছি এই রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। তাঁর এই উপলব্ধি আজ বিজ্ঞানভিত্তিক সত্যে পরিণত হয়েছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমাদের মা-বোনেরা নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে অবস্থান করছেন। ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ুয়া ছাত্রী লংগদুর সুজাতা চাকমা, কাউখালীর থুমাচিং মারমাদের ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়, এখনও জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ-লুটপাট করা হয়, শ্যামলী পলিটেকনিক পড়ুয়া ছাত্র বাঘাইছড়ি উপজেলার আশীষ চাকমার মতো অসহায় ছাত্রের স্বপ্নকে গুম করার পর হারিয়ে যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাইন্দং-এর মানুষের করুণ আর্তনাদ এখনো শুনা যায়। আজ থেকে ৩০ বছর আগে মহান নেতা এম এন লারমাকে হত্যা করার নারকীয় ষড়যন্ত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৮৩ সালে ১০ই নভেম্বর জুম্ম জাতীয় বেঈমান গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশদের নেতৃত্বে একটি কালো অধ্যায়ের জন্ম দেওয়া হয়। এই দিনে শুধু লারমাকে হত্যা করা নয়, একটি স্বপ্ন, একটি আদর্শ, সর্বোপরি একটি সংগ্রামী জীবনকে থামিয়ে দেওয়া এবং এই পথ থেকে সরিয়ে নেওয়ার ঘৃণ্য অপচেষ্টা করা হয়। পরবর্তীতে জুম্ম জনগণ এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কড়া জবাব দেয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিক্রিয়াশীল-বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশরাই ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

আত্মপরিচয়ের বঞ্চিত সমীকরণ

পাভেল পার্থ

পতাকা ও পরিচয়

মা-বাবার কল্যাণে নানান দেশের পতাকার রঙ আর চেহারা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল শৈশবে। তারপর দেখি একটা একটা করে কত নতুন পতাকার জন্ম হয়, পতাকা বদলে যায়। বুঝতে শিখি 'দেশ' আর 'রাষ্ট্রের' ভেতর বিস্তর দূরত্বের গণিত। দেখি দেশের পতাকাকে পতপত করে রাষ্ট্রের পতাকা বানানো হয়। অনেক পতাকার ওড়াওড়ির ভেতর ঘন নীল, উজ্জ্বল লাল, টকটকে সবুজ আর গাঢ় হলুদ রঙের একটি পতাকা দেখে ভিরমি লাগে। এ আবার কোন 'রাষ্ট্রের' পতাকা? আন্নেলি জনসন ঈদ্রি জাতির এক সাহসী নারী। ঈদ্রি, গাবনা এমন অনেক প্রান্তিক আদিবাসী জাতিসমূহ সুইডেন, নরওয়ে ও রাশিয়ার বেশ কিছু অংশ জুড়ে বিস্তীর্ণ সামি অঞ্চলে বৃহৎ সামি আদিবাসী হিসেবে পরিচিত। ১৯৯১ সন থেকে শুরু হয়েছে সামি আদিবাসীদের জন্য এক পৃথক ও স্বতন্ত্র সংসদ। ৩৬ সদস্যের এই 'সামি-সংসদই' সামি আদিবাসী জনগণের এক রাজনৈতিক নির্দেশিকা। উল্লিখিত পতাকাটি সামি আদিবাসীদের সামি অঞ্চলের। আন্নেলি জনসন জানান, এই পতাকা রাষ্ট্রের নয়, সামি ভূখণ্ডের। পতাকার রঙেই চার রঙের পোশাক গায়ে দিয়ে সামি আদিবাসীরা সুইডেন কি নরওয়ের পথেপ্রান্তরে আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়ের রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ঘুরে বেড়ান। ঘন নীল মানে জল, গাঢ় হলুদ মানে সূর্য, টকটকে সবুজ মানে ধরিত্রী আর উজ্জ্বল লাল মানে আগুন। সবকিছু মিলিয়ে সামি জীবনের এক বহমান ঐতিহাসিক আত্মপরিচয়ই বিকশিত হয়েছে সামি পতাকা ও পোশাকে।

বাংলাদেশের সকল আদিবাসী সমাজে এমনই ঐতিহাসিকভাবে বহমান আছে রঙ ও উপস্থাপনের আপনসব আত্মপরিচয়। চাকমা বস্ত্রবিজ্ঞান অনুযায়ী কোনো কাপড় বোনার আগে প্রাথমিক পর্যায়ে চাকমারীতি অনুযায়ী যেসব নকশা করা হয় সেইসব নকশার ব্যাকরণ ও শুরুর নকশাকে চাঙমা ভাষায় আলাম বলে। আলামের মৌলিক লাল, কালো, বেগুনী ও সবুজ রঙগুলোও প্রকৃতি এবং জীবনকে প্রকাশ করে। আলাম যেমন চাকমা জাতির এক আত্মপরিচয়, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের ইনাফি কি ওঁরাওদের কারসা ভাড়া তেমনি এক এক আদিগন্ত আত্মপরিচয়ের নমুনা। পার্থক্য হলো রাষ্ট্র হিসেবে সুইডেন সামি আদিবাসীদের পোশাক ও পতাকার এই আপন আত্মপরিয়ের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছে আর বাংলাদেশ তার আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়কে প্রতিদিন গলা টিপে হত্যা করে চলেছে। পঞ্চাশোর্ধ আন্নেলি জনসন দৃঢ়তার সাথে জানান, আমি কে কি আমার পরিচয় কিভাবে আমি নিজেকে বিরাজিত রাখতে চাই এই সিদ্ধান্ত ও পরিচালনার সূত্র যখন আমার মত করেই আমার আয়ত্তে থাকে তখনি আত্মপরিচয়ের সমীকরণ নিয়ে আমরা আলাপ তুলতে পারি। আর এটি কেবল আমার বয়ে নিয়ে চলা ভূখণ্ডের সীমানাতেই সম্ভব, আমাকে উচ্ছেদ করে বা মালিক কি শাসক কি দাস বানিয়ে এটি কোনোভাবেই সম্ভব নয়। দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশের আদিবাসী জনগণ সাংবিধানিক স্বীকৃতির জন্য লড়াই করে চলেছেন। আর এটি আদিবাসী জনগণের আত্মপরিচয়েরই এক রাজনৈতিক উচ্চারণ। আন্নেলি জনসনের প্রসঙ্গ এ জন্যই উল্লেখ করেছি, কারণ তার কথাগুলো কোনোভাবেই আমার কাছে নতুন মনে হয়নি। এই উচ্চারণ এই স্বাধীন রাষ্ট্রে এই আত্মপরিচয়ের বাহাসকে যিনি প্রথম রাজনৈতিক কায়দায় শ্রেণীপ্রশ্ন হিসেবে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, তিনি মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। ১৯৭৩ সনে তাঁর অসাধারণ সংসদীয় বিতর্ক ও বক্তৃতা থেকে 'কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও গবেষক' শীর্ষক অংশ আজকের আলাপে টেনে আনছি। আত্মপরিচয়ের ব্যাকরণ পাঠে এই অংশটুকুর গুরুত্ব আমার কাছে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক কায়দা মনে হয়েছে।

কে কার কথা বলবে?

আত্মপরিচয় বলতে আমরা 'সচরাচর' রাষ্ট্রে কি বহাল থাকতে দেখি? বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশে এক সময় ২০ হাজার জাতের ধান ছিল। আমরা কি ২০ হাজার ধান জাত নিয়ে কোনো আত্মপরিচয়ের গর্ব করতে দেখেছি রাষ্ট্রকে কোনোদিন? ১৯৬০ এর পর থেকে কোনো কালে? ১৯৬০ মানে তখনই তথাকথিত সবুজ বিপ্লব শুরু হয়, আর আমাদের হাজার হাজার আপন ধানের সত্তাগুলো বিলীন হতে থাকে, যা আমাদের আত্মপচিয়ের এক দুর্বিনীত অংশ। ১৯৭৩ সনের ২৮ জুন সংসদে 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট' এবং কৃষিভিত্তিক গবেষণার গবেষকের ধরণ নিয়ে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। তৎকালীন সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই পয়লা সেই উত্থাপিত প্রস্তাব প্রসঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক বয়ান হাজির করেন। আমরা প্রথমে সেই বিতর্কগুলো দেখে নিই আসুন। কারণ এখান থেকেই আমরা আত্মপচিয়ের সূত্র ও সমীকরণগুলো ধারালো করে নিতে পারি।

জনাব স্পীকার: Amendment in clause 6. Are you moving your amendment, Mr. Larma?

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, আমি আমার amendment move করব। Sir, I beg to move that in clause 6, in para (b) of the bill, in first line, after the word, "Two members of the parliament" the words "and three Model farmers" be inserted.

স্যার, আমার ২ নম্বর amendment-টাও move করছি। Sir, I beg also to move that in clause 6, in para (i) of the bill, be deleted and para (j) be re-numbered as para (i).

জনাব মোঃ আব্দুল সামাদ: জনাব স্পীকার সাহেব, আমি এর বিরোধীতা করি। এটা একটা Vague প্রস্তাব। Model farmer-এর কি definition সেটা এর মধ্যে পরিস্কার করা নাই। সুতরাং, আমি মনে করি select committee যেটা বিবেচনা করেছে সেটা গ্রহণযোগ্য।

শ্রী লারমা: মাননীয় স্পীকার সাহেব, এই দুইটা সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে আমার যে যুক্তি সেটা হল যে, এখানে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য যে বোর্ড করা হয়েছে সেই বোর্ড-এর জন্য বিলের (ন)-তে আছে- "(ন) Two members of parliament to be appointed by Government by notification in the official Gazette" এছাড়াও ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল পর্যন্ত বিভিন্ন সদস্য নেওয়া হয়েছে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, বাংলাদেশ কৃষি ভিত্তিক দেশ। এখানে যাদের সদস্য করা হয়েছে তারা এদেশের সন্তান হলেও সত্যিকারভাবে মাটির সঙ্গে তাদের বিশেষ সম্পর্ক নেই। যে কৃষক রোদে পুড়ে, জলে ভিজে চাষাবাদ করে, নিজের জীবন নিঃশেষে বিলিয়ে দেয়, আজকের এই রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট যেটার দ্বারা বাংলাদেশের খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পূরণ করা হবে, সেখানে তাদের স্থান নাই। আজকে সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে secretary, Ministry of Agriculture; secretary, Ministry of Finance; secretary, Ministry of Planning; Chairman, Bangladesh Agricultural development Corporation; Director of Agriculture (Extension and management); Director of Agriculture (Research and Education); A representative from International Rice Research Institute, Philippines; and Director, Bangladesh Rice Research Institute. আমার আর একটা amendment আছে clause ৬-এর (র)-তে যেটা আছে-A representative nominated by the International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines সে সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, প্রথম সংশোধনী সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, যে দুই জাতীয় সংসদ সদস্যকে রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বোর্ডের সদস্য করা হবে, তাঁরা সাধারণতঃ জাতীয় সংসদের সদস্য নাও হতে পারে। এখানে যেসব সদস্য রয়েছেন তাঁদের মধ্যে বুদ্ধিজীবি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, উকিল, ব্যবসায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক রয়েছেন; কিন্তু কৃষক, যারা সত্যিকারে চাষাবাদ করে, লাঙ্গল ধরে, যাঁরা প্রকৃত মানুষ -এই জাতীয় সংসদে তাঁদের মত এমন প্রতিনিধি আছে কিনা জানি না। আমি একজন কৃষকের ছেলে। কৃষকের ছেলে হয়ে কৃষকের কথাই বলতে চাই। তাই আমি দেখছি যাঁরা কৃষকের অভিজ্ঞতার কথা বলবে তাঁদেরকে এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর যাঁরা 'এয়ার-কন্ডিশন' ঘরে আরাম কেদারায় বসে রিসার্চ করবে এখানে কবল তাঁদেরই নেওয়া হয়েছে।

জনাব স্পীকার: 'মডেল ফার্মার' গবেষণা করতে যায় না, তারা চাষ করতে যায়।

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, এই যে রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট এর আগে নাম ছিল ইষ্ট পাকিস্তান রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট। এটা মোনায়েম খানের আমলে হয়েছিল। তখন আমরা দেখেছি, বই পুস্তক সেখান থেকে বের হত কতজন কৃষক সেটা জানে এবং তাতে জমি চাষাবাসের যে কি নিয়ম ছিল, বাস্তবে তার কতটা প্রতিফলিত হয়েছে। সে জন্য ৩ জন 'মডেল ফার্মার' বা ভাল চাষীকে এর সদস্যভুক্ত করা হোক সেটাই আমি চাচ্ছি।

জনাব স্পীকার: মি. লারমা, আপনার বক্তব্য বোধ হয় পরিস্কার হয়েছে।

শ্রী লারমা: জনাব স্পীকার সাহেব, আমার দ্বিতীয় সংশোধনীর উপর কিছু বক্তব্য আছে। আমার দ্বিতীয় সংশোধনী হচ্ছে A representative nominated by the International Rice Research Institute, Los Banos, Philippines- এটাকে বাদ দেওয়া হোক। জনাব স্পীকার সাহেব, আমি বুঝতে পারি না যে, আমাদের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে বাইরের একটি দেশের লোক কেমন করে এই বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বোর্ডের সদস্য হতে পারেন। আমরা বরং তাদের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারি, তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি। দরকার হলে, এখান থেকে আমরা প্রতিনিধি ফিলিপাইনে পাঠাব। তাছাড়া যেখানে ভাল গবেষণা হচ্ছে, সেখানেই লোক পাঠাব। তাই কেবল ফিলিপাইন গবেষণার ইনস্টিটিউটের লোক নিব কেন? আমাদের দেশের মাটিতে আমরা গবেষণা করব, আমরাই পরীক্ষা করব এবং তার জন্য প্রয়োজন হলে বিদেশ থেকে সাহায্য নিব, বুদ্ধি পরামর্শ নিব। সেই জন্য আমি এটাকে সম্পূর্ণরূপে 'ডিলিট' করতে বলছি।

.... (কৃষিমন্ত্রীর বক্তব্যের পর ভোটে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়) ....

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা উল্লিখিত সংসদীয় বাহাস থেকে আমরা বেশ কিছু নিশানা ও আওয়াজ স্পষ্ট খেয়াল করতে পারি। কে, কার জন্য, কি এবং কিভাবে বলছেন। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গের ভ্রূণ এখানেই। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটে কৃষক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানে সদস্য হিসেবে দেশের বাইরের কারো উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্ন ও প্রসঙ্গসমূহ দেশের সার্বভৌমত্ব ও আত্মপরিচয়ের সুরক্ষিত সীমানার সাথে জড়িত। মানবেন্দ্র প্রশ্ন করেছেন, কেন ধান নিয়ে রাষ্ট্রের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ধান নিয়ে যার আজন্ম অধিকার সেই কৃষকের অংশগ্রহণ থাকবে না? কেন দেশের বাইরের ফিলিপাইনের ইরির কেউ বাংলাদেশের ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবেন? এখানে এম এন লারমা ভৌগলিক সীমানাকে যাপিতজীবনের সংস্কৃতি দিয়ে পাঠ করেছেন। মানুষের অভিজ্ঞতা ও বহমান সংস্কৃতির ঠিকুজির প্রসঙ্গ তুলেছেন। আর এখানটাতেই আমরা আত্মপরিচয়ের সূত্রগুলো হাজির থাকতে দেখি।

আমি কে? কে নির্ধারণ করবে?

আমি একজন কৃষকের ছেলে।
কৃষকের ছেলে হয়ে কৃষকের কথাই বলতে চাই।
(মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: জুন ১৯৭২)

বাংলাদেশের কোটি কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সব দিক নিয়েই আমরা একসঙ্গে একযোগে বসবাস করে আসছি। কিন্তু আমি একজন চাকমা[২]।

(মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা : অক্টোবর ১৯৭২)

এই সংবিধানে আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা বঞ্চিত মানব। আমাদের অধিকার হরণ করা হয়েছে[৩]।

(মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা: অক্টোবর ১৯৭২)

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার বক্তব্য থেকে এখানে তার একধরণের শ্রেণী পরিচয়ও আমরা ঠাহর করতে পারি। তিনি বলেছেন, তিনি একজন কৃষকের ছেলে। মানে এখান থেকে আমরা উৎপাদন সম্পর্কের সাথে জড়িত তাঁর সামাজিক শ্রেণীগত পরিচয়টি পাই, পাই তাঁর লিঙ্গীয় পরিচয়। যখন তিনি আরো বিস্তারিতভাবে নিজেকে চাকমা হিসেবে উপস্থাপন করেন, তখনই গর্বিত কায়দায় প্রকাশিত হয় তাঁর জাতিগত শ্রেণীচরিত্র। পেশা কি জাতি সব ছাপিয়ে তিনি যখন নিজেকে এক বিস্তৃত শ্রেণীর সদস্য হিসেবে নিজেকে পাঠ করেছেন, তখন তিনি নিজেকে বলেছেন 'বঞ্চিত মানব'। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাই নিজের পরিচয় নিজে উপস্থাপন করেছেন রাষ্ট্রীয় দরবারে। তবে এ পরিচয় তিনি গায়গতরে একতরফা নির্ধারণ করেননি। তিনি এই পরিচয়ের ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও বিস্তারকেও টেনে এনেছেন। এই পরিচয় এক বিরাজমান ও বিকাশমান আত্মপরিচয়। যার সাথে তার কৃষি ও উৎপাদন সম্পর্কের জীবন, চারপাশের প্রকৃতি, চলমান সংস্কৃতি এবং সামাজিক বঞ্চনা ও ক্ষমতার বলপ্রয়োগ জড়িয়ে আছে। এই পরিচয় এক সামাজিক দেনদরবার আর শ্রেণীসম্পর্কের ঘাতপ্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে বাহিত হয়েছে। একজন মানুষের কি পরিচয় হবে, কিভাবে হবে, কিভাবে সে তাঁর পরিচয়কে আগলে থাকবে কি থাকবে না সব কিছুই তার চারপাশের সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্কের রূপান্তরের ভেতর দিয়ে আওয়াজ মেলে। আপন কায়দায় এই আওয়াজকে ধারণ করে সামিল হওয়া কি দৃশ্যমানতার বিবরণ তৈরি করাই 'আত্মপরিচয়ের ব্যাকরণ'। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার মতো এই ব্যাকরণ আর কাউকেই এমন প্রবলভাবে রাষ্ট্রসভায় উত্থাপন করতে আমরা দেখি নি।

মানবেন্দ্র যখন বলেন, 'আমি কৃষকের ছেলে', তখন আমরা এক চলমান জুম ও কৃষিজীবন ধারায় বহমান তাঁর এক পরিচয় আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়। এই পরিচয় তিনি নির্মাণ করেননি, এই পরিচয় তিনি বহন করে চলেছেন। এখানে তিনি তাঁর পূর্বজনদের স্মৃতি ও আখ্যানের সূত্র সমন্বয় করেছেন। আর এই অবস্থান থেকেই তিনি কৃষকের কথা বলতে চেয়েছেন। রাষ্ট্রের পরিচয়ের কাঠামোতে তিনি কৃষককে, উৎপাদন ও শ্রম সম্পর্কের সাথে জড়িত তাঁর বাহিত জীবন পরিচয়কে যুক্ত করতে চেয়েছেন। তিনি তাই বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কৃষকের অন্তর্ভুক্তির জোর দাবী তুলেছিলেন। কিন্তু নিদারুণভাবে আমরা দেখতে পাই রাষ্ট্র মানবেন্দ্রর এই আওয়াজকে পাত্তা দেয়নি। নাছোড়বান্দা রাষ্ট্র জনগণের আত্মপরিচয়ের দলিলকে দলিত করে গড়ে তুলেছে বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ব্রি)-এর মতো এক প্রাণ ও জুম-কৃষি সংহারী প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ধান গবেষণা শুরু হয় ১৯১০ সালে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় যা ঢাকা ফার্ম বা মণিপুরী ফার্ম নামে পরিচিত ছিল। ১৯১০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত ৬০টি স্থানীয় ধানের জাতকে ঢাকা ফার্ম থেকে অনুমোদন দেয়া হয়। পাশাপাশি ১৯৩৪ সালে হবিগঞ্জ জেলার নাগুরা এলাকায় স্থাপিত হয় উপমহাদেশের প্রথম গভীর পানির ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বর্তমানে ব্রি'র আঞ্চলিক কার্যালয় হিসেবে কাজ করছে। ১৯৬০ সালেই ফিলিপাইনে স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ইরি)। উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু অঞ্চলে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের প্রবর্তক ইরির মাধ্যমে ঢাকা ফার্ম ১৯৬৬ সালে আইআর-৮ নামের একটি তথাকথিত উফশী ধানের জাত সংগ্রহ করে এবং প্রশ্নহীনভাবে এ দেশের কৃষির ঐতিহাসিক বিরাজমানতাকে অস্বীকার করে ১৯৬৭ সালে মাঠ পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য আইআর-৮ ধান জাতটিকে অনুমোদন দেয়া হয়। তখনই দেশব্যাপী লোকায়ত জুম-কৃষির বিস্তৃত প্রাণবৈচিত্র্যকে কোনো ধরণের বিবেচনায় না এনে তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' নামে মাটির তলার পানি টেনে তুলে-রাসায়নিক সার এবং বিষ প্রয়োগে চালু করা হয় উফশী ধান চাষের নানা প্রকল্প।

১৯৭০ সনে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট বা ব্রিই বাংলাদেশের কৃষিভূমি এবং কৃষকচৈতন্যে তথাকথিত 'সবুজ বিপ্লবের' প্রচলক এবং রাষ্ট্রের বৈধ সমন্বয়ক। ১৯৭০ থেকে ২০১২ সন পর্যন্ত ব্রি হাইব্রিডসহ মোট ৫৮ টি উফশী ধানের জাত 'উদ্ভাবন' এবং অনুমোদন করেছে। কেবলমাত্র ব্রি বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানই নয়, দেশের কোনো কৃষি প্রকল্পেই দেশের সমতল অঞ্চলের কৃষি বা পাহাড় এলাকার জুমচাষের ক্ষেত্রে কখনোই স্থানীয় ধানবৈচিত্র্য এবং লোকায়ত কৃষিচর্চাকে বিবেচনা করা হয়নি। সবুজ বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সংগঠিত এই তথাকথিত কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচি কি দেশের জনগণের কাঙ্ক্ষিত খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছে? যদি এ উন্নয়ন কর্মসূচিকে আমরা দেশের প্রাণ, প্রকৃতি ও জনজীবনের স্থায়িত্বশীলতা সবকিছু দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করি তবে তা এখনো পর্যন্ত কোনোধরণের স্থায়িত্বশীলতার উদাহরণই সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই ইরির ৫০ বছর পূর্তিতে 'সবুজ বিপ্লবের' বিরুদ্ধে বৈশ্বিক প্রতিরোধ সংগঠিত হতে দেখা গেছে। নিপীড়িত কৃষক-কৃষাণীরা ইরির দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বলেছে, ৫০ বছর যথেষ্ট সময়, আর নয়।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা যখন নিজেকে চাকমা হিসেবে পরিচয় দেন, তখনও সেই পরিচয় তার বহমান জীবনআখ্যানই হাজির করে। শ্রম ও উৎপাদন সম্পর্কের পাশাপাশি এখানে জড়িত আছে যাপিতজীবনের আরো জটিল গণিত। রাষ্ট্র যে গণিতকে বারবার 'নাক চেপ্টা আর চ্যাং ব্যাং ভাষা' দিয়ে চিহ্নিত করে সকল ঐতিহাসিকতাকে আড়াল করে ফেলতে চায় জলপাই বাহাদুরি আর উন্নয়নের মারদাঙ্গা চাবুকের তলায়। রাষ্ট্র সেই ১৯৭২ সালেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে 'বাঙালি' হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ৩০ জুন ২০১১ তারিখে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ আদিবাসী-বাঙালিসহ সকলের জাতীয়তা নির্ধারণ হয়েছে 'বাঙালি'। রাষ্ট্র আদিবাসী জনগণের নতুন নাম দিয়েছে, 'উপজাতি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু জাতিসত্তা। পাশাপাশি রাষ্ট্র সমসাময়িক কালে বলছে, দেশে

২. *বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক। বিষয়: সংবিধান-বিল বিবেচনা (দফাওয়ারী পাঠ), খ- ২ সংখ্যা ১৩। মঙ্গলবার, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৭২*

৩. প্রাগুক্ত

কোনো আদিবাসী নাই। রাষ্ট্র যখন জনগণের পরিচয় নির্মাণ করার মরদাঙ্গা জিইয়ে রাখে, তখনই দেশের পতাকা রাষ্ট্রের মাধ্যমে ছিনতই হয়ে যায়। তখনই দেশ ও রাষ্ট্রের ভেতর তৈরি হয় যোজন যোজন দূরত্ব। এ দূরত্বকে রাজনৈতিক কায়দায় মোকাবেলার জন্য নিম্নবর্গের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ সামিল থাকলেও জরুরী এক বিপ্লবী শ্রেণী জাগরণ। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা শেষ পর্যন্ত সেই লড়াই শুরু করেছিলেন।

কৃষকের ছেলে বা চাকমা নয়, মানবেন্দ্র শেষতক নিজের পরিচয়ের সীমানা বিস্তৃত করেছেন 'বঞ্চিত মানব' হিসেবে। বলেছেন, অধিকারহীন। এখানে আর চেপ্টা কি খাড়া নাক, ধলা কি কালা, কৃষক কি জেলে মজুর কি তাঁতী নারী কি পুরুষ কাউকেই আর আলাদা পরিচয়ে দেখা হয়নি। এই সীমানা বঞ্চিত অধিকারহীন নিম্নবর্গের এক জোরালো পাটাতন। কিন্তু কোনোভাবেই মানবেন্দ্র তাঁর কৃষক ও চাকমা পরিচয়কে গায়েব করে ফেলেননি। বরং বারবার তিনি তা রাজনৈতিকভাবে স্পষ্ট করেছেন। সকল দলিত বঞ্চিত বর্গ সমূহের এক সম্মিলিত শ্রেণীকেই তিনি 'বঞ্চিত মানব' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। যেখান থেকে প্রবল ক্ষমতার বিরুদ্ধে শ্রেণী প্রতিরোধ আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবেই আমরা দেখেছি ক্ষমতার বলপ্রয়োগ কিভাবে কৃষক, আদিবাসী ও বঞ্চিত মানবের উপর বারবার প্রশ্নহীন কায়দায় হামলে পড়েছে। নিরন্তর ক্ষমতাহীনের আত্মপরিচয়কে ফানা ফানা করে ক্ষমতা কাঠামোর পরিচয়কেই চাপিয়ে দেয়ার জবরদস্তি বহাল রেখেছে।

১৮৫৫ সনের সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়েও আমরা দেখেছি বাঙালি বা দিকুরা কিভাবে আদিবাসী জনগণকে ঘিরে এক অন্যায় শোষণের বলয় তৈরি করেছিল। নেত্রকোণার সুসং দূর্গাপুরে হাতীখেদা আন্দোলনের সময়ও আমরা দেখেছি হাতীবাণিজ্যের বিরোধীতাকারী হাজংদের রাজা-অবাধ্য নামে ঘোষণা করা হয়। সেখানেও শুরু হয়েছিল রাজা-বাধ্য আর রাজা-অবাধ্যের এক শ্রেণীসংগ্রাম। উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহে বিরসা মুন্ডা উপনিবেশ রাষ্ট্রের জুলুমের বিরুদ্ধে এই আওয়াজ দিয়েছিল। এক প্রবল উপনিবেশের ভেতরে থেকেও যারা নিজেদের আপন জাতিগত শ্রেণীজাগরণের স্ফুলিঙ্গসমূহ একত্র করে অন্যায় আর জুলুমের বিরুদ্ধে বারবার রুখে দাঁড়ান তারাই 'আদিবাসী'। জাতিরাষ্ট্রের বৈষম্যের গণিতে যারা অনিবার্যভাবে গরিব, সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক হয়ে পড়েন। যাদের কোনো অধিকার ও ন্যায়বিচার থাকে না। রাজা, জমিদার, মহাজন, জোতদার, দিকু, দিয়াড় আর প্রবল বাঙালিগিরি বিরুদ্ধে যাদের বারবার লড়াই করে যেতে হয়। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কোনোভাবেই নিম্নবর্গের এসব শ্রেণীপ্রশ্নকে আমলে নেয়নি, করে রেখেছে 'দুধভাত নাগরিক'। শ্রী হরিদাস পালিত ১৯৩২ সালে কায়স্থ সমাজ পত্রিকায় 'বাংলার আদিম জাতি ও সভ্যতা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, এ দেশের আদিম আধিবাসীরা-হড়, হো (কোল) নামক জাতি, এরাই এদেশের আদি মানব; তারাই তাদের দেশকে বলত 'বাংলো'। এদেশটা জলবহুল দেশ, জলাভূমি যথেষ্ট, ছেঁচে জল ক্ষেত্রে দিতে হতো না। বাং মানে না, আর লো মানে পাত্র ডুবিয়ে জল তোলা। তা থেকে জল ছেঁচাও বোঝায়। যে দেশে ছেঁচে জল দিতে হয় না, জল ছেঁচার আবশ্যক হয় না, অর্থাৎ ধান্যক্ষেত্রে জলের অভাব হয় না সেই দেশই 'বাংলোদিশম'। ইহাই তাদের জন্মভূমি (আয়ু-দিশম)। আর্য বৈদিকেরা এদেশের নাম করেন নাই।

নিদারুণভাবে আমরা দেখতে পাই রাষ্ট্রের মনোজগত ও নিপীড়নের বারুদ বারবার ঝলসে দেয় আদিবাসী ভুবন। এক আদিবাসী আত্মপরিচয়কে ঘিরেই রাষ্ট্র যা শুরু করেছে, বুঝে হোক না বুঝে হোক রাষ্ট্র তার ঝুরঝুরে রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ করে দিচ্ছে বারবার। অমুক তমুক বাহিনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রকে কেন বারবার নিরাপত্তার ব্যর্থ ছল তৈরি করতে হয় বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বাহিনী কেন নিরপরাধ বেসামরিক জনগণের উপর হামলা চালায়? এসব বাহাস আর দেনদরবার নিয়েই হয়তো রাষ্ট্র বিকশিত হয় 'সুশীল' ভাবাদর্শের জখম ছড়িয়ে। আমরা সেদিকে আজকের আলাপে যাচ্ছি না। কিন্তু রাষ্ট্র যখন আদিবাসী জনগণের উপর নিরাপত্তা বাহিনীর অবিরাম নিপীড়নকে 'নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব কর্তব্য' হিসেবেই বৈধ করতে চায় আমাদের দ্বন্দ্বটা সেখানেই। আমরা এটি দেখে অভ্যস্ত হয়েছি যে, জলবিদ্যুতের নামে সামাজিক বনায়নের নামে বাণিজ্যিক খননের নামে কি পর্যটনের নামে কি সেনাস্থাপনা সম্প্রসারণের নামে আদিবাসী জনপদ উচ্ছেদ হবে। জনশুমারীতে আদিবাসী পরিসংখ্যান উধাও হয়েই থাকবে। রাষ্ট্র জনগণের যাপিতজীবন নিয়ে নিরাপত্তার যে পাতানো খেলা খেলে চলে আদিবাসীদের সেখানে 'দুধভাত' বানিয়েই রাখা হয়েছে। আদিবাসীদের নিয়ে রাষ্ট্রের অধিপতি মনস্তত্ত্বের মূলে রয়েছে এক ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিকতা। উপনিবেশিকতার এই অন্যায় ঘোর ভেঙে নতুন সম্পর্ক বিনির্মাণের ভেতর দিয়েই সুরক্ষিত হবে আত্মপরিচয়ের আপন সীমানা। অন্য কোনোভাবেই এটি ঘটবে না, ইতিহাসের সূত্র ও সমীকরণ সেই আওয়াজ দেয় না।

কার রচনা? কার ইতিহাস?

বলা হয়ে থাকে, এখনও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর সঠিক ইতিহাস রচিত হয়নি বা সঠিকভাবে ইতিহাস রচনা করা হয়নি। কিন্তু যতটুকু রচিত হয়েছে, তার সবখানেতেই লেখা আছে 'মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির গৌরবময় ইতিহাস'। দেশের সকল প্রান্তের আদিবাসী জনগণ মুক্তিযুদ্ধে জানবাজি রেখে অংশ নিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন। তারপরও মুক্তিযুদ্ধ কেবলি বাঙালির ইতিহাস। ঠিক যে কায়দায় মুক্তিযুদ্ধে নারী ও হিজড়াদের দুবির্নীত অংশগ্রহণকেও আড়াল করে বারবার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হয়ে ওঠে কেবলি 'পুরুষের ইতিহাস'। এ প্রশ্নটি দীর্ঘদিনের। অমীমাংসিত। কিংবা মীমাংসার অতীত। কার রচনা কে রচনা করবে কিভাবে করবে? ইতিহাস কার দৃষ্টিতে কার ইতিহাস হিসেবে কার জন্য কিভাবে কোন কায়দায় এবং কেন নথিভুক্ত হবে? একথা অস্বীকার করার কোনো কারণই নেই যে, ইতিহাস মানেই ক্ষমতাকাঠামোর ইতিহাস। বিদ্যমান রচনাসমূহ তাই আড়াল করে ফেলে নিম্নবর্গের আত্মপচিয়ের আহাজারি ও আখ্যান। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বিষয়টি রাজনৈতিভাবে উপলব্ধি করেছেন। সংসদে এ নিয়ে বিতর্ক তুলেছেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট তার বোর্ডের সদস্য করতে চেয়েছিল আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের

মনোনীত প্রতিনিধিকে। মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ছাড়া আর কেউ এর প্রতিবাদ করেননি। বা করতে চাননি বা প্রতিবাদ করার মতো রাজনৈতিক যোগ্যতাই তাদের ছিল না। বাংলাদেশের কৃষিভূগোল ও বাস্তুসংস্থানের সাথে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কহীন ফিলিপাইনের লসবানুসে অবস্থিত ইরি কিভাবে বাংলাদেশের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রীয় পাবলিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধি হতে পারে? কিভাবে রাষ্ট্র দেশের প্রাণসম্পদ ও প্রকৃতির সীমানা বহিরাগত কর্পোরেট জিম্মায় ছেড়ে দিয়ে সার্বভৌমত্বের মেকি গণতন্ত্রের ঝকমারি বজায় রেখেছে তা বুঝতে হলেও আমাদের সেই সময়ের সংসদীয় বিতর্কগুলো জানা বোঝা জরুরী। একজন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মপরিচয়ের সংগ্রামকে পাঠ ও পাঠ্য করা জরুরী। উত্তর আমেরিকার বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তরে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা পরামর্শক দল বা সিজিআইএআর এবং ইরি মিলেই গোলার্ধ জুড়ে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের নামে শুরু হয় 'প্রাণডাকাতি'। হাজার হাজার শস্য ফসলের জাত ও প্রাণসম্পদের বিপুল ভাণ্ডার চলে যায় তাদের জিম্মায়। পরবর্তীতে তাদের হাত ধরেই সিনজেনটা, মনস্যান্টো, কারগিল ও ডুপন্টের মতো কর্পোরেট কৃষি-বিষ কোম্পানিরা দুনিয়ার কৃষি ও জুম সীমানা দখল করে নেয়। যেন এ এক অনিবার্য নিয়তি।

মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা কৃষি ও জুম সীমানার এই সর্বনাশা পরিস্থিতি আঁচ করেছিলেন। তাই তিনি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের জোর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, আমাদের মাটি আমাদের জমি আমরাই চাষ করবো, আমরাই গবেষণা করবো। কৃষি কি জুম যেহেতু আমাদের জীবনমরণের ইতিহাস, সেই ইতিহাস রচনার দায় ও দায়িত্ব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা অন্য কোনো বহিরাগতের কাছে ছাড়তে চাননি। কারণ তিনি জানপ্রাণ দিয়ে আপন ইতিহাসের বিস্ময় ও বৈচিত্র্যের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে আমরা কি দেখছি, রাষ্ট্র কি দেশের জনগণের পরিচয় ও বেঁচেবর্তে থাকবার প্রাণসম্পদের কি কোনো ধরণের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পেরেছে? না কোনো ভাবেই পারেনি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট নির্দয়ভাবে ২০১২ সালে সংরক্ষিত আট হাজার ধানের জাতকে গলা টিপে হত্যা করেছে। জনগণের ধানের জাতকে জনগণের কোনো অনুমোদন ছাড়াই গবেষণার নামে ব্রি তুলে দিয়েছে কর্পোরেট সিনজেনটা কোম্পানির জিম্মায়। একক আয়তনে দুনিয়ার সবচে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমিতে শেল কোম্পানিকে খননের অনুমোদন দিয়েছে। লাউয়াছড়া বনভূমিকে ছাড়খাড় করে দিয়েছে অক্সিডেন্টাল, ইউনোকল ও শেভরন। অথচ, সেই ১৯৭২ সালেই মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা রাষ্ট্রের কাছে দাবী তুলেছেন, আমাদের গবেষণা ও কাজ আমরাই করবো। মানবেন্দ্রর এই 'আমরা' উচ্চারণের ভেতর দিয়ে আমরা এক সামগ্রিক বাংলাদেশের আত্মপরিচয়কে প্রবলভাবে খুঁজে পাই। তিনি সকল ধরণের অন্যায় ও দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণকে 'আমরা' হিসেবে পাঠ করেছেন। তিনি নিজেই সেই জনগণের অংশ হিসেবে নিজেকে সাহসের সাথে পরিচিত করেছেন। এই 'আমাদের' ভেতরেই তিনি 'বঞ্চিত মানব', 'চাকমা' ও 'কৃষকের ছেলের' পরিচয়কেও সমমর্যাদা ও রাজনৈতিক কায়দায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। মানবেন্দ্রর আত্মপরিচয়ের এই সমীকরণ আমাদের বারবার দেশের আদিবাসী কি বাঙালি সকলের আত্মপরিচয় সাহসীকতার সাথে তুলে ধরার এক মৌলিক রাজনৈতিক পাঠ্য। দেশের প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যপুস্তকে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার এই দীক্ষা ও দর্শন যুক্ত ও চর্চা করা জরুরী। কারণ তা না হলে, আপন আত্মপরিচয়ের আপন নির্মাণ ও ভূগোল থেকে বারবার কেবলমাত্র আদিবাসী নয়, দেশের সকল জনগণকেই ছিটকে পড়তে হবে। নিরুদ্দেশ ও আড়াল হয়ে যেতে হবে।

আন্নেলি জনসনকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কেন সুইডেন সরকার জাতিসংঘের আদিবাসী বিষয়ক ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করছে না? আন্নেলির স্পষ্ট জবাব, এর এমন কি দরকার? আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের আত্মপরিচয়ের সূত্র ও সমীকরণগুলি তরতাজা রাখার জন্য রাষ্ট্রের সাথে লড়াই করে চলি। রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া কোনোভাবেই দুনিয়ার কোথাও আদিবাসী জনগণের মুক্তি সম্ভব নয়। আমি সরাসরি রাষ্ট্রের সাথে প্রতিনিয়ত দেনদরবার করে চলি। একটি ঘোষণা কি দলিলে কি আছে কি নেই তা কিন্তু আমার বহমান আত্মপরিচয়কে আটকে ফেলতে পারে না। ঘোষণা কি দলিলের জন্য আমি নই। আমার জন্যই ঘোষণা কি দলিল তৈরি হয়েছে। আর আমাদের সামি আদিবাসীদের এই রাজনৈতিক চেতনাই আমরা মনে করি, আমাদের আত্মপরিচয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রসঙ্গ টেনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ঠিক এমনি আদিবাসী আত্মপরিচয়ের সর্বজনীন সূত্রকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্রের একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি জনগণের যাপিতজীবনের সম্পর্কের ভেতর দিয়ে জনগণের কায়দায় দেখতে চেয়েছেন। প্রয়োজনে বহিরাগত সহযোগিতা নেয়ার ক্ষেত্রেও তিনি মন্তব্য করেছেন। কিন্তু সবার আগে দরকার নিজেদের জন্য নিজেদের মতো করে নিজেদের অংশগ্রহণে একটি নিজেদের প্রতিষ্ঠান, নিজেদের সীমানা। মানবেন্দ্রর এই অবস্থান হয়তো প্রতীকী অর্থে কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের সাপেক্ষে একটি কিন্তু এর ভেতর দিয়েই রাষ্ট্রকে ছাপিয়ে জনগণের সামনে এক আপন 'দেশের' রূপ ও আওয়াজ উন্মুখ হয়ে ওঠে। আর সেই দেশের পতাকাই তখন জনগণের পতাকা হয়ে ওঠে। আত্মপরিচয় ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার সকল সূত্র ও সমীকরণ এখানেই। জনগণের রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমার আত্মপরিচয়ের এই সমীকরণ মানতে বাধ্য।

পাভেল পার্থ: গবেষক, প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
ই-মেইল : animistbangla@yahoo.com
রচনাকাল : নভেম্বর ২০১২

এম এন লারমা: যে পথ তিনি দেখিয়ে গেছেন

ধীরকুমার চাকমা

ইতিহাসের আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী জুম্ম জাতি যখন বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে তখন জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি হচ্ছেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জাতির অবিসংবাদিত নেতা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনিই হচ্ছেন প্রেরণার উৎস ও অগ্রপথিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ব্যবহৃত যে প্রদীপ (চাঁদি) তিনি জ্বেলে গেছেন তা আজো নিভেনি। তার আলোর শিখা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় পাতায় অদ্যাবধি জ্বলছে। তারই আভা আগামী প্রজন্মের কাছে ছড়িয়ে দিতে বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তাঁর ৭৪তম জন্ম দিবস উদযাপিত হয়েছে। নেয়া হয়েছে দু'দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচী। ১৪ সেপ্টেম্বর শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, হাই স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে "এম এন লারমার জীবন ও দর্শন" শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতা এবং পরদিন ১৫ সেপ্টেম্বর "এম এন লারমার জীবন ও চিন্তা: বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা" শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা সভা শেষে পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁর ৭৪তম জন্ম দিবসের দু'দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচীর সমাপ্তি ঘটে।

১৮৫৮ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয়। এই বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে ভারতের ঔপনিবেশের জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল। পরিশেষে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়েই এই সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সমস্যারও সূত্রপাত ঘটেছিল '৪৭ সালে। যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্ব পার্বত্যাঞ্চলের জন্য কোন কিছুই করে উঠতে পারেনি। অধিকন্তু ষাট দশকে পাকিস্তানের বুনিয়াদি গণতন্ত্রের নির্বাচনের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের সামন্ত নেতৃত্ব জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনামলের শেষ দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের শিক্ষিতদের মধ্যে কৃষ্ণ কিশোর চাকমা (এম এন লারমার জেঠা), চিত্ত কিশোর চাকমা (এম এন লারমার বাবা)সহ প্রমুখ শিক্ষাবিদরা শিক্ষা বিভাগের চাকরীতে যোগদানের পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সমাজসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাবিদদের কিছু অংশ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজসংস্কার আন্দোলন ক্রমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে মোড় নেয়। এ সংগ্রামে মহান নেতা এম এন লারমা ছিলেন সেই সমাজসংস্কারক উত্তরসূরীদের অন্যতম। যিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথম বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হয়েছিলেন।

১৯৭২ সালে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সদস্য-সচিব এবং ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত পার্টির (জেএসএস) প্রথম কংগ্রেসের মাধ্যমে পার্টির প্রথম সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যেই সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছিলেন যুগপৎ আন্দোলনের ধারা। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পার্টির নীতি-কৌশল ও শক্তিশালী নেতৃত্ব। তিনিই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রথম বাংলাদেশ সংসদে নির্বাচিত প্রথম জুম্ম এমপি, যিনি বাংলাদেশের সাংসদ হিসেবে ১৯৭৪ সালে পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি হিসেবে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদানের জন্য লন্ডন সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা পার্বত্য চট্টগ্রামের গন্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিস্তৃতি লাভ করেছে। তাই তিনি কেবলমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের নেতা নন; তিনি সমগ্র দেশের আদিবাসী তথা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের নেতাও বটে। তাঁর প্রগতিশীল আদর্শ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণের সংগ্রামের চালিকা শক্তি। তাঁর অনুজ ও বর্তমান পার্টি সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু) নেতৃত্বে ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন; বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম গঠন এবং দেশের অভ্যন্তরে সমমনা রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম হচ্ছে এম এন লারমা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই স্বপ্নের ধারাবাহিক রূপরেখা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর দেশে সামরিক শাসন কায়েম হয়। দেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপট পাল্টে যায়। একই বছরে সেপ্টেম্বর-এ পার্টির সশস্ত্র শাখার তৎকালীন প্রধান ও পার্টির বর্তমান সভাপতি সন্তু লারমা বাংলাদেশ পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হবার পর পার্টিতে তীব্র নেতৃত্ব সংকট দেখা দেয়। পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় স্থবিরতা। এমতাবস্থায় এম এন লারমা সশস্ত্র আন্দোলনের হাল ধরেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, ট্রাইবেল কনভেনশন গঠন করে এবং 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ভিত্তিতে জাতি-ভিত্তিক সংগঠন ইত্যাদি গঠন করে সামরিক সরকার সর্বাত্মকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন প্রতিরোধের কার্যক্রম শুরু করে। এই কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে সরকার প্রথমতঃ ১৯৭৯ সালে জিয়া সরকার কর্তৃক পার্বত্যাঞ্চল উপদ্রুত বিল ঘোষণা; দ্বিতীয়তঃ সমতল এলাকা হতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপকহারে সেটেলার বাঙালি বসতি

প্রদান ও অন্যদিকে জুম্মদেরকে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মতো গুচ্ছগ্রাম, শান্তিগ্রাম ও বড়গ্রামে বসবাসে বাধ্যকরণ; তৃতীয়তঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে ব্যাপক সেনা সমাবেশ ও বিভিন্ন নামে দফায় দফায় সেনা অভিযান পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম হাতে নেয়।

উপদ্রুত বিল পাস হবার পর বাছবিচারহীনভাবে ধরপাকড় শুরু হলে তৃণমূল পর্যায়ে পার্টি সংগঠনসমূহের উপর তীব্র আঘাত আসে। আদিবাসী জুম্ম জনগণের হাট-বাজার ও গতিবিধির উপর কঠোর সামরিক নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। আর সেনা সংখ্যা ও অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালি সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মদের ভূমি অধিকার ও জান-মালের উপর নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। বৃদ্ধি পায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো সীমাহীন ঘটনা। জুম্মদের ভূমি বেদখল, আদিবাসী জুম্ম নারী ধর্ষণ, অপহরণ, ধর্ষণের পর হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি পার্বত্য চট্টগ্রামে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়। লোক দেখানো উন্নয়নের নামে আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহকে আন্দোলন বিমুখ করতে আদিবাসী জুম্মদের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের বিষবাষ্প ছড়ানো হয়। সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানীয় সেনাছাউনীর নিয়ন্ত্রণে শান্তকরণ প্রকল্প দ্বারা অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালি পুনর্বাসন, পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন বিরোধী নিত্য নতুন পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে।

ঠিক এমনি এক ক্রান্তিকালে পার্টি সংগঠনের অভ্যন্তরেও পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে মাতোয়ারা হয়ে উঠে চার কুচক্রীরা। সেসময় ঘরে-বাইরে পার্টির অবস্থান সুদৃঢ় করতে গিয়ে এম এন লারমা বহুবিধ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তদুপরি ১৯৮২ সালের শুরু থেকে তাঁর অধিকাংশ সময় অসুস্থতার মধ্য দিয়ে কেটেছে। যে জন্য তাঁকে চিকিৎসায় যেতে হয়েছিল। ইতিপূর্বে ১৯৮০ সালের ২২ জানুয়ারি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু) কারামুক্তি লাভ এবং পার্টির কাজে পুনঃযোগদান পার্টি সংগঠনে নুতনভাবে গতি সঞ্চার করে। চিকিৎসা থেকে ফিরে এসে অগ্রজ-অনুজ দ্বিতীয় জাতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠান আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কংগ্রেস প্রস্তুতির শুরুতে বিভেদপন্থীরা আসন্ন কংগ্রেসকে ভন্ডুল করা এবং পার্টি নেতৃত্ব সম্পর্কে কর্মীবাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমগ্র পার্টি সংগঠনকে "দুই ভাই-এর পার্টি" বলে অপব্যাখ্যা দিতে থাকে। তা সত্ত্বেও এ সময় পার্টির প্রগতিশীল নেতৃত্ব অনায়াসে কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাসে এ সব কারণে ১৯৭৫-৮৩ সাল ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কালপর্যায়।

১৯৮২ সালের ২৪-২৭ সেপ্টেম্বরে পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কংগ্রেসে বিভেদপন্থীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে পার্টির সর্বোচ্চ ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র শুরু করেছিল। কংগ্রেসে চার কুচক্রী দ্রুত নিষ্পত্তিবাদীদের নীতিহীন বক্তব্য কংগ্রেসের পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। বিস্ফোরণোন্মুখ মুহূর্তেও কোনরূপ উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে অকুতোভয়ে মহান নেতা কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের সামনে দাঁড়িয়ে জুম্ম জাতির বিকাশের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা ঐতিহাসিক বাস্তবতার নিরিখে ব্যাখ্যা করেছিলেন। সবিস্তারে তুলে ধরেছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম জাতির অস্তিত্ব সংরক্ষণে প্রগতিশীল নেতৃত্বের ভূমিকা ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের তত্ত্ব। এভাবে তাঁর সুতীক্ষ্ণ যুক্তির সামনে বিভেদপন্থীদের যুক্তি খন্ডিত হয়ে যায় এবং সমঝোতার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। অবশেষে তাঁকে যথারীতি দ্বিতীয়বার পার্টির সভাপতি করে দ্বিতীয় কংগ্রেস সফল সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। কংগ্রেসে পরাজিত হয়েও বিভেদপন্থীরা ক্ষান্ত হয়নি। কংগ্রেস সমাপ্তির ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর বিভেদপন্থীদের নির্মম ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক আক্রমণে মহান নেতা এম এন লারমার জীবনাবসান ঘটে। এরূপ বর্বরতাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্মরা ঘৃণাভরে ধিক্কার জানিয়েছিল। এম এন লারমা "লড়াই করে বেঁচে থাকার শিক্ষা দিয়ে" যে পার্টি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ আজো সে পার্টি সংগঠনের মূল শিকড় আগলে ধরে রেখেছেন। তাই পার্টির নেতা-নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার মধ্য দিয়ে জুম্ম জাতিকে নেতৃত্বহীন করার জন্য জাতীয়-আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মুখেও আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে এবং থাকবে।

১৯৮৩'র বিভেদপন্থীরা এম এন লারমাকে হত্যা করে আন্দোলনের ইতিহাসে কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। আর আজকে সুধাসিন্ধু-রূপায়ণ-তাতিন্দ্র নব্য বিভেদপন্থীরা পার্টির মূলধারা নেতৃত্বকে ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনকে কুঠারাঘাত করেছে। জুম্ম জনগণ তাদের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। সাধারণ জনজীবন তাদের কাছে জিম্মি হয়ে রয়েছে। এম এন লারমা পৃথিবীর মানব সমাজ বিকাশের নিয়মাবলীকে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজব্যবস্থা বিকাশে যে স্বার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন; আজ তারা সেকথা বেমালুম ভুলে গেছেন। অথচ কথায় কথায় তারা নিজেদের জেএসএস'র মূলধারার ধারক-বাহক হিসেবে দাবি করে থাকেন। এজন্য '৮৩-র বিভেদপন্থীর প্রেতাত্মারাও তাদের দেখে লজ্জা পায়। নব্য বিভেদপন্থীরা পার্বত্য চুক্তি সম্পাদন-পূর্বকালে নিঃসন্দেহে সাচ্চা দেশপ্রেমিকের ভূমিকা রেখেছিলেন। কিন্তু চুক্তি-উত্তরকালে ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে পার্টি সংগঠনের মূলধারা থেকে ছিটকে পড়েছিলেন। হতবাক করেছিলেন জুম্ম জনগণকে। বিপরীতে দোষ চাপান পার্টির মূল নেতৃত্বের ঘাড়ে।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আদিবাসী জুম্ম জনগণ ছিল শাসক-শোষক গোষ্ঠীর দাবার ঘুটির মতো। ১৯১৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুবক সমিতি, ১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি, ১৯৫৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র সমিতি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষক সমিতি, ১৯৬৬ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি ইত্যাদি সংগঠন গড়ে তোলা হলেও এসব সংগঠনসমূহ আদিবাসী জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলের চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি গঠন করে এম এন লারমা জুম্ম জাতির জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের গৌরবময় সংগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের

ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। যেখানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জনগণ তথা ছাত্র-যুবসমাজ শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিঃস্বার্থভাবে সামিল হয়েছিল।

এম এন লারমার নেতৃত্ব সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে। আন্দোলনে তঁর নেতৃত্ব নির্ভুল সেটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। তবুও কোন কোন সুবিধাবাদী মহল বিভ্রান্তিকর জনমত গঠনের জন্য পত্র-পত্রিকান্তরে পার্টির দ্বিধাবিভক্তির কথা তুলে ধরে থাকে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের যে আদিবাসী জুম্ম জনগণ তিন দশকাধিক কালোত্তীর্ণ সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ তাদের কাছে পার্টির দ্বিধাবিভক্তির কথা ভিত্তিহীন। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ জানে যে, এম এন লারমার প্রতিষ্ঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন। জুম্ম জনগণকে সাথে নিয়ে সকল চক্রান্তের জাল ভেদ করে এম এন লারমার আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। ষাট দশকে এম এন লারমা যে ছাত্র আন্দোলনের সূচনা করে গেছেন; সেই ছাত্র আন্দোলন এখনো ফুরিয়ে যায়নি। তার দ্বিতীয় পর্যায় একবিংশ শতাব্দীর ছাত্র-যুবসমাজ দিয়ে শুরু হতে হবে। এম এন লারমা সঠিক দর্শনে সুসজ্জিত হয়ে সংগ্রামের যে পথ নির্দেশ করে গেছেন, সে পথ চলাই হোক এম এন লারমার ৩০তম মৃত্যু দিবসে আদিবাসী জুম্ম জনতা এবং ছাত্র-যুবসমাজের বজ্রকঠিন শপথ।

"যে যত আদর্শবান, সে তত ক্ষমাশীল, ত্যাগী, সাহসী, বিপ্লবী ও দূরদর্শি হতে পারে।"

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

"ক্ষমা গুণ, শিক্ষা গ্রহণের গুণ ও পরিবর্তিত হওয়ার গুণ—এই তিন গুণের অধিকারী না হলে প্রকৃত বিপ্লবী হওয়া যায় না।"

—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পক্ষে-বিপক্ষে সংঘাত ও কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয়

উদয়ন তঞ্চঙ্গ্যা

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সমস্যাদির মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত সমস্যা হলো ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে নিয়ে চলমান পক্ষে-বিপক্ষে সংঘাত। এই সংঘাতকে নিয়ে আজ নানামুখী আলোচনা-সমালোচনা চলছে। কেউ বলছে, উভয় পক্ষের যদি জুম্মদের অধিকার আদায়ই লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে এ ধরনের বিভেদ বা হানাহানি কেন? কেউ বলছে, ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত জুম্ম জনগণের চলমান আন্দোলনকে দুর্বল করছে। এর ফলে আখেরে শাসকগোষ্ঠীর সুযোগসন্ধানী কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলেরই লাভ হচ্ছে। কেউ বলছে, যে কোন বিষয়ে মতভিন্নতা থাকতেই পারে তাই বলে এধরনের হানাহানি কখনোই কাম্য নয়। কেউ বলছে, এ ধরনের সংঘাত শাসকগোষ্ঠীর 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে অধিকতর গতিশীল করছে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেকোন বিষয়ে মতভিন্নতা থাকতেই পারে তাই বলে হানাহানি হবে কেন এ প্রশ্ন আসতেই পারে। জনসংহতি সমিতিও স্পষ্টই বলেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রতি জুম্ম জনগণ নিরঙ্কুশভাবে সমর্থন করবে তা কখনোই সমিতি আশা করেনি। প্রত্যেকেরই অধিকার আছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে সমর্থন করার, আবার প্রত্যাখ্যান করারও। কিন্তু কথা হচ্ছে চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ এই নয় যে, চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতিকে ধ্বংস করা, সমিতির নেতৃত্বকে বিনাশ করা বা সমিতির সদস্য-সমর্থকদের হত্যা, অপহরণ, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় করা। আড়াই দশকের অধিক সময় ধরে আত্মবলিদান ও কঠোর ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে 'কালো চুক্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করা; পার্বত্য চুক্তিতে কোন অধিকার অর্জিত হয়নি; এই চুক্তির মধ্য দিয়ে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে, সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং জুম্ম জনগণের দাবি ও অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছে ইত্যাদি বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচারণা চালানোর মাধ্যমে জুম্ম জনগণের মধ্যে অনৈক্য ও বিভাজন তৈরি কখনোই কাম্য হতে পারে না। এটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের দীর্ঘ তিন দশকের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও কঠোর আত্মত্যাগের ফসল। বলা যায়, এ চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার-বঞ্চিত ও বিলুপ্তপ্রায় জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণ ও বিকাশের ন্যূনতম ভিত্তি রচিত হয়েছে। এ চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামকে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে স্বীকার করা এবং এই বৈশিষ্ট্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে নিয়ে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন সংরক্ষণের বিধান করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও করা-যাদের উপর সাধারণ প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, উন্নয়ন, ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, পুলিশ, রক্ষিত বন ব্যতীত অন্য সকল বন, পরিবেশ, কৃষি, স্বাস্থ্য, পর্যটন, শিক্ষা, যুব উন্নয়ন, পশুপালন, সমাজকল্যাণ ইত্যাদি বিষয়গুলো অর্পিত হয়েছে; বেসামরিকীকরণের লক্ষ্যে সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা; জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তুদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন করা; ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি করা ও অস্থানীয় নিকট প্রদত্ত ভূমি ইজারা বাতিল করা; পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকুরীতে জুম্মদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়োগ প্রদান করা ইত্যাদি অধিকার অর্জিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এসব বিষয়গুলো (অধিকারগুলো) কোনভাবেই খাটো হতে পারে না। পাঁচদফা দাবীনামার নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি অর্জিত না হলেও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অনুরূপ দায়িত্ব, ক্ষমতা ও অধিকার কম-বেশী এই পার্বত্য চুক্তিতে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে বলা যায়। পাঁচদফা দাবীনামার পররাষ্ট্র, অর্থ ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলো কম-বেশী এ চুক্তিতে সন্নিবেশিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। ভারতের প্রাদেশিক ব্যবস্থায় কতিপয় বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যেভাবে কতিপয় রাজ্যের (যেমন মিজোরাম ও নাগাল্যান্ড) অধিকার রয়েছে, তেমনি পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বা পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রযোজ্য আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের মতামত গ্রহণের বিধানে অনেকটা সেরূপ অধিকারেরই স্বীকৃতি রয়েছে। তাই আজ দেশে-বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির প্রতি ব্যাপক সমর্থন ও চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের ক্ষেত্রে এই চুক্তি আজ একটি আইনী হাতিয়ারে ও রাজনৈতিক সনদে পরিণত হয়েছে। অথচ চুক্তি-বিরোধী পক্ষ এই চুক্তিকে 'কালো চুক্তি', এ চুক্তিতে কোন কিছুই নেই, এ চুক্তি আত্মসমর্পণের দলিল ইত্যাদি বক্তব্য দিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম সমস্যা সেটেলার বাঙালিদের অনুপ্রবেশের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি চুক্তিতে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও পরোক্ষভাবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ধারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা এ সমস্যা সমাধানে সরাসরি ভূমিকা রাখে। যেমন-অউপজাতীয় (বাঙালি) স্থায়ী বাসিন্দাদের সংজ্ঞা নির্ধারণ, তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সার্কেল চীফ কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র প্রদানের বিধান, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রচলিত আইন, রীতি ও পদ্ধতি মোতাবেক ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তিকরণ,

তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত ভূমি বন্দোবস্তী ও হস্তান্তরে বাধা-নিষেধ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট জন্ম-মৃত্যুর পরিসংখ্যান বিষয়টি অর্পণ ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম। এসব বিষয়গুলো বাস্তবায়িত হলে সেটেলার সমস্যা বা অনুপ্রবেশের সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। বিশ্ব রাজনীতির একাধিপত্য যুগে ও পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রবল আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে এ ধরনের জনমিতি সমস্যা সমাধানে নিঃসন্দেহে চুক্তির এসব বিষয়গুলো একটি উত্তম সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অথচ এসব বিষয়গুলোকে কোনরূপ বিবেচনায় না নিয়ে চুক্তিবিরোধী গোষ্ঠী চুক্তির বিরুদ্ধে বাস্তব-বিবর্জিতভাবে অবস্থান নেয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার বা সমালোচনা করার প্রত্যেকেরই গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। কিন্তু এ চুক্তিকে বিরোধিতা করতে গিয়ে জনসংহতি সমিতিকে বা চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াকে সশস্ত্রভাবে প্রতিরোধ ও বানচাল করা কখনোই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক হতে পারে না। এটা স্রেফ হঠকারী, আত্মঘাতি, অগণতান্ত্রিক, বিভেদকামিতা বৈ কিছু নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে দূরভিসন্ধিমূলক, ষড়যন্ত্র-প্রসূত ও জুম্ম স্বার্থ-বিরোধী বলে নিঃসন্দেহে বিবেচনা করা যায়।

দীর্ঘ প্রায় তিন দশক ধরে নানা রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও রণ-কৌশলগত সংগ্রামের বিনিময়ে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে যেখানে জুম্মদের মধ্যে ঐক্য-সংহতি জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা ছিল সেখানে চুক্তি স্বাক্ষর হতে না হতেই প্রসিত-সঞ্চয় নেতৃত্বাধীন চক্রান্তকারী গোষ্ঠী যারা পরবর্তীতে ইউপিডিএফ নামে একটি তথাকথিত সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাস শুরু করে। পার্বত্য চুক্তির মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসা জনসংহতি সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা তাদের স্ব স্ব গ্রামে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন শুরু করতে থাকেন তাদের উপর সশস্ত্র হামলা শুরু করে। তাদের অপহরণ করে হয় খুন করে না হয় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দেয়। চার শতাধিক প্রত্যাগত সদস্যকে এলাকা ছাড়া করে দুর্বিষহ জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। শুধু জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য নয়, চুক্তি সমর্থক নিরীহ জনগণের উপরও একই কায়দায় চড়াও হতে থাকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা। ১৯৯৮ সালের ১৮ জানুয়ারিতে নানিয়ারচরের কুতুকছড়িতে জনসংহতি সমিতির সমর্থক অশ্বিনী কুমার চাকমাকে নৃশংস লাঠিপেটা ও কুপিয়ে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া হত্যাযজ্ঞের অংশ হিসেবে একে একে আজ অবধি প্রায় ২৫ জন জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্যসহ সমিতির শতাধিক সদস্য ও সমর্থককে হত্যা করে। এছাড়া রয়েছে শত শত ব্যক্তিকে অপহরণ, মারধর, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ আদায় ইত্যাদি নৃশংসতা। যার মধ্যে ১৩ জুন ১৯৯৮ তারিখে জনসংহতি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ানসহ জনসংহতি সমিতির চারজন সিনিয়র প্রত্যাগত সদস্যকে অপহরণ অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অতি সম্প্রতি ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ লংগদু থেকে জনসংহতি সমিতির ৬২ জন সদস্য ও সমর্থককে অপহরণের ঘটনা এবং তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে দফায় দফায় মুক্তিপণ আদায় জুম্ম জনগণসহ দেশে-বিদেশে মানবতাবাদী ব্যক্তিবর্গকে হতবাক করেছে।

এমনকি জনসংহতি সমিতির বর্তমান সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার উপরও হত্যার উদ্দেশ্যে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অন্ততঃ চার বার সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। ১৯৮৩ সালে ১০ নভেম্বর যেভাবে গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্র অতর্কিতে বিশ্বাসঘাতকতামূলক হামলা চালিয়ে মহান নেতা মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমাকে হত্যা করেছে সেভাবে সন্তু লারমাকেও হত্যার চেষ্টা করছে ইউপিডিএফ দুর্বৃত্তরা। তাই তাদেরকে চার কুচক্রী বিভেদপন্থীদের প্রেতাত্মা বললে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ইউপিডিএফের এই সশস্ত্র সন্ত্রাস সাধারণভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। এটা স্রেফ ভাইয়ে ভাইয়ে সংঘাত বা হানাহানি বলার কোন সুযোগ নেই। একটা অধিকারকামী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে বিভাজন তৈরী করা, বিভেদপন্থার আশ্রয় নিয়ে জুম্মদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা, সর্বোপরি জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের লক্ষ্যে চলমান একটি পরীক্ষিত আন্দোলনকে গলাটিপে হত্যার করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে, চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে ঘিরে শুরু হওয়া চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষের সংঘাতে আজ জুম্ম সমাজ দিশেহারা। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চলা এ সংঘাতের ফলে মানুষের জীবন চরম নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। এই চলমান সংকটের ফলে শুধু জুম্ম জনগণ নয়, পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী বাঙালি অধিবাসীরাও নানাভাবে এর শিকার হচ্ছে পক্ষ-বিপক্ষের সংঘাত-প্রবণ এলাকায় জনমানুষের জীবন-জীবিকা সংঘাতের কাছে সম্পূর্ণভাবে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এসব সংঘাত-প্রবণ এলাকায় জনজীবন এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, যেকোন মুহূর্তে যে কোন ব্যক্তির জীবনপ্রদীপ নিভে যেতে পারে। ১৯৮২-৮৪ সালে সংঘটিত জনসংহতি সমিতির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা বিভেদপন্থী গিরি-প্রকাশ-দেবেন-পলাশ চক্রের শুরু করা গৃহযুদ্ধের পর বর্তমান সময়েই জুম্ম সমাজ সবচেয়ে বেশী চরম সংকটের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হচ্ছে। জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমি সংরক্ষণের স্বার্থে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে অচিরেই এই সংকট থেকে জুম্ম জনগণকে মুক্ত হতে হবে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ লংগদু থেকে জনসংহতি সমিতির ৬২ জন সদস্য ও সমর্থককে অপহরণের পর অতি সাম্প্রতিক সময়ে এ সংকট নিরসনে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে নানা উদ্যোগ নিতে দেখা যায়। গত ২৮ এপ্রিল ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটির উদ্যোগে 'রাজনৈতিক সংঘাত নয়, সহাবস্থান চাই' শ্লোগানের ভিত্তিতে রাঙামাটিতে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে। সমঝোতা আর সংহতি পথেই জুম্মদের একমাত্র মুক্তি বলে নাগরিক কমিটির প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়। শারীরিকভাবে নির্মূল করার কাজটি গণতান্ত্রিক রীতি বিরুদ্ধ, অনৈতিক ও অযৌক্তিক বলেও উল্লেখ

করা হয়। নাগরিক কমিটির এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু তাদের বক্তব্যে কেবল নীতিকথাই বলা হয়েছে। সমাধানের কোন সূত্র তাদের বক্তব্যে দেখা যায়নি। গণতান্ত্রিক রীতি বিরুদ্ধ তাদের ভাষায় 'ভ্রাতিঘাতি সংঘাত' এর অবসান কিভাবে হবে তার কোন সমাধানসূত্র তাদের বক্তব্যে ছিল না। অগণতান্ত্রিক ধারায় সশস্ত্র উপায়ে পার্বত্য চুক্তি বিরোধী কার্যক্রম অবসানে কি করা দরকার তার সুস্পষ্ট বক্তব্য উঠে আসেনি। সহাবস্থানের আহ্বান করা হলেও কিভাবে চুক্তি বিরোধী ও চুক্তি পক্ষের মধ্যে সহাবস্থান গড়ে উঠবে তার কোন ব্যাখ্যা ছিল না তাদের প্রচারপত্রে। একটা বৈর দ্বন্দ্ব যা সশস্ত্র রূপ লাভ করেছে তা কিভাবে গণতান্ত্রিক ধারায় রূপান্তর করা যায় তার উপায় বাতলে দেয়া হয়নি। বস্তুতঃ নাগরিক কমিটির ব্যাখ্যায় কেবল সমস্যার গভীরতা তুলে আনা হয়েছে; কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত, কার্যকারণ ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সচতুরভাবে ও রহস্যজনকভাবে এড়িয়ে যান। নাগরিক কমিটি কেবল সাধারণ আহ্বান জানিয়েই দায়সাড়াভাবে তার দায়িত্ব শেষ করেছে, বিশেষ ব্যবস্থার কোন পরামর্শপত্র প্রদানে তারা সম্পূর্ণভাবে নীরব থাকেন।

তাই নাগরিক কমিটির উদ্যোগকে প্রশংসাযোগ্য মনে করা হলেও চলমান এ সংঘাত নিরসনে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের এই উদ্যোগের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল সমস্যা-যা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই ইস্যু নিয়ে নাগরিক সমাজের কতিপয় ব্যক্তি জনমত গঠনের জন্য রাজনৈতিক কায়দায় উদ্যোগ নিতেও দেখা যায়, যা অনেকাংশে তিন দশক ধরে লড়াই-সংগ্রামের বিনিময়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে অপপ্রচারণার সামিল বলে বিবেচনা করা যায়। এই অপপ্রচারণা কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। জাতীয় পর্যায়ের বন্ধুভাবাপন্ন কতিপয় রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, সংবাদ ও মানবাধিকার কর্মীদের মধ্যেও এ ইস্যুটাতে এমনভাবে উপস্থাপন করা হতে থাকে যা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন ও জনসংহতি সমিতি সম্পর্কে একটা বিভ্রান্তিকর ধারণা গড়ে উঠতে সহায়তা করছে। শুধু তাই নয়, জাতিসংঘের নারীর প্রতি সংহিংসতা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদক (স্পেশাল র‌্যাপোটিয়র) মিজ রাশিদা মনজো বাংলাদেশ সফরকালে গত ২৭ মে ২০১৩ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পরামর্শসভায় এ ভ্রাতিঘাতি সংঘাতের বিষয়টি নাগরিক সমাজের জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক উত্থাপন করা হয়, যা ছিল উক্ত বিশেষ প্রতিবেদকের কার্যপরিধির সাথে অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিতও বটে। এমনকি নিউইয়র্কের জুম্মদের মধ্যে এবং অতি সম্প্রতি (সেপ্টেম্বর ২০১৩) নেপালে নারী অধিকার নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে এ বিষয়টি নানা আঙ্গিকে উত্থাপন করা হয় বলেও জানা যায়, যা পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের বীরত্বপূর্ণ ও গৌরবময় সংগ্রামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার একটা অপকৌশল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এছাড়া সংঘাত সমাধান বিষয়ক বিশেষজ্ঞ এনে সংঘাত নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্প হাতে নিয়ে লাভজনক কর্মসূচী নিতেও দেখা যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রচারাভিযানের অংশ হিসেবে নাগরিক কমিটি এই ইস্যুর উপর 'অভিষ্ট অর্জনে হিংসা নয়, সমঝোতার পথই উত্তম' নামে একটি বুকলেটও (আগস্ট ২০১১) প্রকাশ করে, যেখানে ইউপিডিএফের প্রচার সম্পাদক নিরণ চাকমাসহ ফেইসবুকের বেনামী লেখকের অনেক লেখা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ ছিল। এমনকি ফেইসবুক লেখকদের মধ্যে সংস্কারপন্থী সমর্থকদের লেখাও ছিল। এ বুকলেটের লেখাগুলোতে একতরফা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য তুলে ধরা হয়। পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরে যারা এই সশস্ত্র সংঘাতের গোড়া পত্তন করেছিল, সেই চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের প্রচার সম্পাদকের লেখা উক্ত বুকলেটে থাকলেও চুক্তি পক্ষের কোন লেখা এই বুকলেটে ছিল না, যা ছিল অনভিপ্রেত ও অপ্রত্যাশিত।

মোট কথা হচ্ছে এ সমস্যাকে বস্তুনিষ্ঠভাবে সমাধানের পরিবর্তে এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক সংগ্রাম, চুক্তি স্বাক্ষরকারী রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি তার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে একটি রাজনৈতিক ফায়দা লুটার সূক্ষ্ম এজেন্ডা নিহিত রয়েছে বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি ছড়ানোর দেশের শাসকগোষ্ঠীর যে দীর্ঘদিনের নীতি জারী রয়েছে তাতেও একটা সহায়ক ক্ষেত্র হিসেবে এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে কাজ করছে। দেশের শাসকগোষ্ঠী গোড়া থেকেই জুম্ম জনগণের আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যক্রম, চাঁদাবাজ ও দুষ্কৃতকারীদের কর্মসূচী, জনস্বার্থ বিরোধী তৎপরতা ইত্যাদি নামে অভিহিত করার অপচেষ্টা চালিয়ে আসছে। দেশের শাসকগোষ্ঠী এবং সুযোগসন্ধানী কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল বরাবরই 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ভিত্তিতে জুম্মদের মধ্যে নানা ইস্যুতে বিভাজন তৈরি করতে সদা সক্রিয় রয়েছে। চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যকার সংঘাত শাসকগোষ্ঠীর সেই এজেন্ডা বাস্তবায়নে যেমন সহায়ক ভূমিকা পালন করছে, তেমনি নাগরিক সমাজের অবিমৃষ্য কর্মসূচীর ফলেও শাসকগোষ্ঠীর সেই ঈপ্সিত লক্ষ্যকে সামনে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার পেছনে নাগরিক কমিটির ভাষায় এই চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষ সংঘাতই দায়ী বলে উল্লেখ করা হয়, যদিও এই বক্তব্য সর্বাংশে সত্য নয়। বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জুম্ম জনগণের ভূমিকা হচ্ছে সহায়কা ভূমিকা, পক্ষান্তরে নির্ণায়ক ভূমিকা রয়েছে সরকারের হাতে। বলা যায়, চুক্তির বিধান অনুসারে জনসংহতি সমিতি তার করণীয় সবকিছু করেছে। এখন সরকারকেই চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। তবুও এটা সত্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে তথা জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণের স্বার্থে এ ধরনের চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষ সংঘাত অবশ্যই যতদ্রুত সম্ভব নিরসন হওয়া দরকার। এজন্য প্রধান ও জরুরী কাজ হলো- ইউপিডিএফ কর্তৃক সশস্ত্র কার্যক্রম হাতে নেয়ার মধ্য দিয়ে এ সংঘাতের সূত্রপাত ঘটেছে, সেই সশস্ত্র কার্যক্রমের অবসান করা। ইউপিডিএফকেই সর্বপ্রথমেই সেই সশস্ত্র কার্যক্রম পরিহার করতে এগিয়ে আসতে হবে। তাই এ সংঘাত

নিরসনে সাধারণ আহ্বানের পাশাপাশি অবশ্যই বিশেষ ব্যবস্থার কার্যক্রম থাকতেই হবে। আর সেই বিশেষ ব্যবস্থার প্রথম ধাপ হলো-ইউপিডিএফের সশস্ত্র কার্যক্রমকে পরিত্যাগ করা। এজন্য ইউপিডিএফকে তাদের অবৈধ অস্ত্র ও গোলাবারুদ যেকোন নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে চুক্তি পক্ষের সশস্ত্র প্রতিরোধের কথাও আসতে পারে নিঃসন্দেহে। ইউপিডিএফের সশস্ত্র কার্যক্রম থেকে সরে আসলে চুক্তি পক্ষের প্রতিরোধ বা আত্মরক্ষার কোন ভিত্তি থাকার প্রশ্নই আসে না, ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিক গতিতে এটিরও সমাধান চলে আসবে।

এখানে এটা পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরী যে, সশস্ত্র কার্যক্রম বন্ধ করানো ছাড়া এ জাতীয় সংঘাতের অবসান হতে পারে না। যারা সশস্ত্র আন্দোলন ও কর্মসূচীর সাথে যুক্ত, তারা জানেন যে, অস্ত্র কোনদিন অলসভাবে বসে থাকতে পারে না। যে কোন গোষ্ঠীকে অস্ত্রগুলো হাতে রেখে তাদেরকে সশস্ত্র হামলা থেকে নিবৃত্ত করা যাবে না। তাই সশস্ত্র কার্যক্রম সম্পূর্ণ পরিত্যাগ না করে হাজার সমঝোতা স্মারক চুক্তি হলেও সেই সমঝোতা কোন স্থায়ীত্ব লাভ করবে না। সেটা প্রকৃত সমাধান হবে না। তাই চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষের সংঘাত স্থায়ী ও প্রকৃত নিরসন করতে হলে ইউপিডিএফকে সশস্ত্র কার্যক্রম থেকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

তাই নাগরিক সমাজের মধ্যে যারা চুক্তি পক্ষ-বিপক্ষের আত্মঘাতি সংঘাত নিরসনে কাজ করতে চায় তাদেরকে অনুরোধ রাখতে চাই যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে নিজেকে নিবেদিতপ্রাণ ভাববো, আর চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে আন্দোলন করতে সাহস করবো না তা হতেই পারে না। এ বিষয়গুলো নাগরিক সমাজকে সুস্পষ্ট করতে হবে। এক্ষেত্রে সাহসী হতে হবে ও বাস্তব সত্যকে তুলে ধরতে দ্বিধাগ্রস্ত হলে হবে না। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' হলে চলবে না। কেবল সাধারণ আহ্বান করে, আর এ সংঘাত নিয়ে বিভ্রান্তিকর ও হঠকারী প্রচারাভিযান চালিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের বাস্তব অবস্থাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করানো কোন অবস্থাতেই কারো কাম্য হতে পারে না।

"যারা মরতে জানে পৃথিবীতে
তারা অজেয়। যে জাতি বেঁচে
থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারে না,
পৃথিবীতে তাদের বেঁচে থাকার কোন
অধিকার থাকতে পারে না।"

—এম এন লারমা

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী মুক্তি আন্দোলন

জড়িতা চাকমা

নারীর উপর যুগ যুগ ধরে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী মুক্তি আন্দোলনকারীরা সংগ্রাম করেছেন নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। উনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে নারী মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও কুন্দপ্রভা সেন গুপ্ত, বীরকন্যা প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত প্রমুখ মহিয়ষী নারীদের মহান আত্মত্যাগ উপমহাদেশে নারী মুক্তি আন্দোলনকে বেগবান করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্ত ও মা-বোনের মান-সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে ১৯৭২ সালে আত্মপ্রকাশ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। শুরু হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্মদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। এ সংগ্রামে সমিল হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী সমাজ। আজ পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি এবং হিল উইমেন্স ফেডরেশন হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীদের প্রতিনিধিত্বকারী দুটি সংগঠন।

একটি জাতি কতটুকু উন্নত, সেটা নির্ভর করে সে জাতির সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী সমাজ কতটুকু অধিকার ভোগ করে থাকে তার উপর। সে দিক থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম জাতি যে পরিমাণ সামন্তবাদ, ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ ও বিজাতীয় শাসন-শোষণে নিমজ্জিত ছিল; ততোধিক পরিমাণে সামন্তবাদ ও পুরুষতান্ত্রিক শাসন-শোষণ, নিপীড়ন নির্যাতনে জর্জড়িত ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী সমাজ। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুশাসন, আইন-কানুন ইত্যাদি পর্বত্য চট্টগ্রমের আদিবাসী জুম্ম নারী সমাজকে গন্ডিবদ্ধ ও ঘরকুনো করে রেখেছে। আর সে সমস্ত কড়ায়-গন্ডায় প্রতিপালনের মধ্য দিয়েই একজন জুম্ম নারী, পুরুষের কাছে নিজেকে সেবাদাসী হিসেবেই উৎসর্গ করতে অভ্যস্ত হয়। যা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী জীবনের প্রতি পদে পদে। সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন, সন্তানধারণ তথা মানবিক জীবনের সর্বত্র পুরুষের অধীনতা থেকেই সমাজে কথায় কথায় 'অবলা নারী' কথাটার প্রয়োগ আমরা দেখতে পাই। এ সব পশ্চাৎপদতা ঝেড়ে-মুছে ধীরে ধীরে জুম্ম নারী সমাজকে সুকৌশলে এগুতে হবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী সমাজ বিশ্বের নারী মুক্তি আন্দোলনের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ হচ্ছে মূলতঃ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। একদিকে বাইরের জগতে যেমনি পুরুষের একাধিপত্য রয়েছে তেমনি পরিবারেও রয়েছে পিতার একচ্ছত্র কর্তৃত্ব। পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম সমাজে একজন নারী হয়ে জন্মানোর অর্থ হচ্ছে, কখনো পুত্র, কখনো ভ্রাতা, কখনো স্বামী, কখনো শ্বশুর, কখনো ভাসুর কিংবা দেবর ইত্যাদি হিসেবে সর্বত্র পুরুষকে আদর-যত্ন, সেবা-শুশ্রুষা করাই যেন একমাত্র কাজ। এক কথায় প্রত্যেক পরিবারে পুরুষ সদস্যরা শাসকের ভূমিকা আর নারী সদস্যরা সেবিকার ভূমিকা-এই দ্বিবিধ চরিত্র নিয়েই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম সমাজে ছেলে-মেয়েরা গড়ে উঠে। পরিণত বয়সে জুম্ম সমাজে নারী-পুরুষের সামাজিক মূল্যবোধটাও সেভাবে তৈরী হয়। সমাজের এই মর্মকথা এম এন লারমা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই জাতীয় সংসদে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদেব সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবীর প্রাক্কালে মহান নেতা এম এন লারমা বলেছিলেন, 'সমাজে পুরুষ যে অধিকার ভোগ করে, নারীকেও সে অধিকার দিতে হবে।' তাই পার্টির গঠনতন্ত্রেও নারী-পুরুষের সম-অধিকারের কথা তুলে এনেছেন। তারই লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি আত্মপ্রকাশ করে। যেটাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী সমাজের মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীর বহিরাঙ্গণে বিচরণ সূচিত হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের সব অঞ্চলে মহিলা সমিতির কর্মীদের পার্টির কর্মীবাহিনী এবং সচেতন জুম্ম জনগণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে অন্তর্বর্তীকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদেও নারী প্রতিনিধিত্বকে নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি গঠনের পর ১৯৭৭ সালের এপ্রিল মাসে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির মাসব্যাপী রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রশিক্ষণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পারিবারিক জীবনে পুরুষ কর্মীদের সহায়তা করার জন্য কর্মী পরিবারসমূহের গৃহকর্ত্রীকে সচেতন করা। কিন্তু তাতে সরাসরি সামরিক কার্যক্রমে জুম্ম নারীদের অংশগ্রহণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। একজন সার্বক্ষণিক কর্মী দীর্ঘদিন ধরে কর্মক্ষেত্রে অবস্থানের ফলে সংশ্লিষ্ট কর্মী পরিবারের সমস্ত দায়িত্বভার কাঁধে নিতে হয় গৃহকর্ত্রীকেই। একটি কর্মী পরিবারে সমাজ, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে পরিবারের কর্তার অবর্তমানে গৃহকর্ত্রীই পার্টির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। তাই দু' যুগ ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের সশস্ত্র আন্দোলনে গৃহকর্ত্রী হিসেবে জুম্ম নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। দুই যুগাধিককালের সশস্ত্র আন্দোলনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ জুম্ম নারীরা তাদের শ্রম ও মেধা দিয়ে আন্দোলনে সহায়তা করেছিলেন। চুক্তি-পূর্ব

পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির একাধিক সক্রিয় নেত্রী ছিলেন যারা চুক্তি-উত্তরকালেও সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন; যদিও ১৯৯৭ সালে মাত্র একজন মহিলা নেত্রীর নাম স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাগত জেএসএস সদস্যদের তালিকায় দেখা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী মুক্তি আন্দোলনকে, নানা বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ পর্যায়ে ১৯৭৫ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর যে অবস্থান, সে অবস্থান থেকে উঠে আসতে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতিকে নানারকম লাঞ্চনা-বঞ্চনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তারপর পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম জোরদার হলে সেনাবাহিনী ও সেটেলার বাঙালির নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছিল আদিবাসী জুম্ম নারীকে। ১৯৭৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা-অপারেশন বৃদ্ধি পাওয়ার এক পর্যায়ে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষরা তখন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতো; হাট-বাজার বর্জন করতে বাধ্য হতো। এমন সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীরাই হাট-বাজার ও সংগঠনের অন্যান্য যোগাযোগ রক্ষার কাজ করতো। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাভিযানের সময় পুরুষশূন্য জুম্ম গ্রামে সেনাবাহিনী ঢুকলে তখন জুম্ম নারীদের সামনে যে বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয় তা একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কেহ অনুধাবন করতে পারে না। উন্মত্ত সেনার সামনে একজন অবলা জুম্ম নারীর অবস্থা প্রকাশ করার মত ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের এক পর্যায়ে মহান নেতা এম এন লারমা দেখলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী জুম্ম সমাজের বৃহৎ অংশ জুম্ম নারী সমাজকে বাদ দিয়ে জাতীয় অস্তিত্ব ও জন্মভূমির অস্তিত্ব সংরক্ষণ সম্ভব নয়। যেকোন দেশে জাতীয় মুক্তির সাথে নারী মুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

দেশের শিক্ষাঙ্গণেও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারী সমাজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ হিল উইমেন্স ফেডারেশন গঠিত হয়। গঠনের পর পরই লে. ফেরদৌস এর নেতৃত্বে কতিপয় সেনা সদস্য কর্তৃক এই সংগঠনের নেত্রী কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃত্বকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়নি। ঘরে-বাইরে এই সংগঠন অপেক্ষাকৃত নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছে। হিল উইমেন্স ফেডারেশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে যে সমস্ত আদিবাসী জুম্ম নারী ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছেন এবং হচ্ছেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঘরে-বাইরে সে সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদ করে থাকে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন যৌথভাবে আদিবাসী নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশের অভ্যন্তরে জাতীয় পর্যায়ের মহিলা সংগঠনের সাথে যোগসূত্র বজায় রেখে চলেছে। বিশেষ করে হিল উইমেন্স ফেডারেশন দেশের শিক্ষাঙ্গনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জুম্ম ছাত্রীদের নিজস্ব জাতীয় স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখা ও আদিবাসীদের কৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য লালন-পালনের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও হিল উইমেন্স ফেডারেশন পদচারণা অব্যাহত রয়েছে। বেইজিং-এ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনেও হিল উইমেন্স ফেডারেশন প্রতিনিধিত্ব করেছে। নিজস্ব আদিবাসী জাতীয় সংস্কৃতির মান উন্নয়নের পাশাপাশি ভবিষ্যতে জুম্ম নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্যও ভূমিকা পালন করে থাকে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি।

ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরও বাংলাদেশের সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী ১৪টি আদিবাসী জুম্ম জাতিসমূহের কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন হলে তবেই তার সুফল আদিবাসী নারীরা ভোগ করতে পারবেন। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন ছাড়া অন্য কোন সংগঠন জুম্ম নারী মুক্তির আন্দোলন চালিয়ে নিতে আসবে না। কারণ অন্যরা সহজে জাতীয় রাজনৈতিক দলসমূহের লেজুড়ে পরিণত হয়ে থাকে। দেশে সরকার রদবদল শুরু হবার সাথে সাথে এই লেজুড়বৃত্তি বেড়ে যায়। জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের নাম করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারী সমাজের কিছু কিছু নেত্রীকে বিভ্রান্ত করে থাকে। ফলতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থেকে তারা সরে দাঁড়ান। বিগত উপজেলা পরিষদ নির্বাচনকালে কতিপয় উপজেলায় আদিবাসী জুম্ম নারী উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ নিঃসন্দেহে জিতে নিয়েছেন। এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির ব্যানারে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের কাছে এদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু নির্বাচন-উত্তর কালে জনস্বার্থে প্রকল্প পাইয়ে দেবার অছিলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কতিপয় নেত্রী (উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান) পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে কোন না কোন জাতীয় রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন। কাজেই জুম্ম নারী সমাজের আন্দোলন বেগবান করতে গিয়ে নানাবিধ বাঁধার প্রাচীর অতিক্রমের পাশাপাশি সুবিধাবাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য জুম্ম নারী নেতৃত্বকে অধিকতর সতর্ক হতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীরা সেটেলার বাঙালিদের অত্যাচার ও সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হয়ে রয়েছে। অনুপ্রবেশকারী সেটেলার বাঙালিরা জুম্মদের ভূমি দখলের অন্যতম উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে আদিবাসী জুম্মদের নারী-শিশুদের অপহরণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যা করার পথ। এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ সংঘটনকারীদের উপযুক্ত শাস্তির কোন ব্যবস্থা প্রশাসন গ্রহণ করেনি। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ হতাশ হয়ে নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে জানমাল রক্ষার পথ খুঁজতে থাকে। এভাবে ১৯৮৬ সালে সেটেলার বাঙালিদের আক্রমণে সব হারিয়ে একমাত্র প্রাণ নিয়ে ৬০,০০০ জুম্ম ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের

শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। যারা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেনি তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল নিজ বাস্তুভিটা ছেড়ে গহীন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। তারাই আজ আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু হিসেবে পরিচিহ্নিত। এই উদ্বাস্তুদের মধ্যেও নারী-শিশুরাই সবচেয়ে বেশী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। চুক্তির আগে-পরে একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা সেটেলার বাঙালিদের নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু। পাশবিক নির্যাতন ছাড়াও আদালতে অদ্যাবধি অনেক আদিবাসী জুম্ম মহিলার নামে মিথ্যাভাবে ভূমি মামলা রজ্জু হয়ে রয়েছে। পার্বত্য চুক্তি-উত্তর কালে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন চুক্তি অনুসারে যথাযথভাবে কাজ না করাতে পার্বত্য চট্টগামে ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। রোধ হয়নি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ। বিশেষ করে ভূমিবিরোধকে কেন্দ্র করেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীর প্রতি সেটেলার বাঙালিদের সহিংসতা লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ভূমি বেদখল ও নারী নির্যাতন এই দুই এর উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অনেক ঘটনা ১৯৯০ সালে সিএইচটি কমিশন "জীবন আমাদের নয়" রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সিএইচটি কমিশন ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থিত ৬০,০০০ জুম্ম শরণার্থী শিবির ঘুরে অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামে শরণার্থী পরিত্যক্ত অঞ্চল তথা উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিবরণ মানবাধিকার কমিশনের রিপোর্টে এপর্যন্ত দফায় দফায় অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তার কোন সন্তোষজনক পদক্ষেপ সরকার গ্রহণ করেছে বলে প্রমাণ মিলে নি। এমনকি প্রতিশ্রুতি দিয়েও ঐতিহাসিক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করায় পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম মূল সমস্যা ভূমি সমস্যা। পার্বত্য চুক্তি অনুসারে ভূমি সমস্যা যেমনি সমাধান হয়নি তেমনি রোধ হয়নি পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী-শিশু নির্যাতনের মতো মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধ।

রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও জুম্ম নারীর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন দৃষ্টান্ত মিলেনি। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে সাধারণ সংসদ সদস্যের সর্বমোট আসন সংখ্যা হচ্ছে ৩০০। এরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এছাড়াও জাতীয় সংসদে যাতে ন্যূনতম সংখ্যক নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায় এবং ধীরে ধীরে যাতে নারীরা নির্বাচনের মূলধারায় প্রবেশ করতে পারে, তজ্জন্য সংরক্ষিত আসনের বিষয়টি ১৯৭২ সালে প্রবর্তন করা হয়। আশা করা হয়েছিল যে, এর মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সম-অংশগ্রহণকে বাধগ্রস্ত করে এমন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা ভবিষ্যতে দূরীভূত হবে এবং পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। কিন্তু এ আশা গুঁড়ে-বালিতে পরিণত হয়। দেশের রাজনৈতিক দলগুলো থেকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারীই শুধু দলীয় মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাচ্ছে। তাতে করে কিন্তু পার্বত্য চুক্তি-উত্তরকালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আদিবাসী নারীদের অংশগ্রহণের কোন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হতে পারছে না।

সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই বিধানটি এযাবৎ তিনবার নবায়ন করা হয়। প্রথমতঃ ১৯৭২ সালে সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে দশ বছর মেয়াদের জন্য ১৫টি সংরক্ষিত আসনের বিধান রাখা হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে প্রথমবার সংরক্ষিত আসনের বিধান নবায়ন করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৮ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ১৫ বছর করে আসন সংখ্যা ৩০-এ উন্নীত করা হয়, যা ১৯৮৭ সালে শেষ হয়ে যায়। ১৯৯০ সালে দ্বিতীয়বার নবায়ন করা হয়। ১৯৯০ সালে সংবিধানের দশম সংশোধনীতে দশ বছর মেয়াদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, যার মেয়াদকাল ২০০১ সালের জুলাই মাসে শেষ হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ২০০৪ সালের ৪ মে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ তৃতীয়বার নবায়ন করা হয়। তৃতীয়বার নবায়নের সময় সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫টি করা হয় এবং জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিত্বের আনুপাতিক হারে ৪৫টি আসনে সরাসরি মনোনয়নের বিধান করা হয়। পার্বত্য চুক্তির পর ২০০৪ সালে সংরক্ষিত নারী আসনের মেয়াদ তৃতীয়বার নবায়ন করা হলেও এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও অন্যান্য আদিবাসী জুম্ম নারীদের স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনা হয়নি। উপরন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের বাইরে রাখা হয়েছে। আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বর্তমান ক্ষমতাসীন মহাজোট জনসংহতি সমিতির প্রতি কোনরূপ ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেনি। সর্বোপরি জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে আদিবাসী জুম্ম নারীদের জন্য (পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরও) তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) স্বতন্ত্রভাবে কোন আসন সংরক্ষণ করা হয় নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীরা অদ্যাবধি রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া থেকে বহু দূরে।

পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সাথে সামিল হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম্ম নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য অনেক দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। তিন দশকাধিক কালের রক্তাক্ত সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি থেকে সবেমাত্র একজন মহিলা সদস্য পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য পদ লাভ করেছেন। পার্বত্য চুক্তি অনুসারে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া অবধি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম নারীকে বিরামহীনভাবে কাজ করে যেতে হবে। অন্যথায় সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজেদের যোগ্য আসন প্রতিষ্ঠা ও সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বরাবরই পিছিয়ে থেকে যাবে। সমাজে নারী-পুরুষদের সমান অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই মহান নেতা এম এন লারমা পার্বত্য চট্টগ্রামে শোষণহীন সমাজ এবং সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন বার বার। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অব্যাহতভাবে প্রগতিশীল নীতি-আদর্শ ধারণ করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

আদিবাসীর আত্মপরিচয়ের লড়াই

ফারহাত জাহান

উত্তরবঙ্গের এক আদিবাসী নারী আমার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা নারী-পুরুষ উভয়েই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করি। কিন্তু প্রতিদিন তিনবেলা ভালোমতো খেতে পাই না। বলতে পারেন আমরা এত চরম দরিদ্র কেন?' আমি উপলব্ধি করলাম, এ প্রশ্ন শুধু কোনো একক ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে নয়, বরং তা বৈশ্বিক মানবতাবাদ, জাতীয় রাজনীতির নীতিনির্ধারণ ব্যবস্থাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। একই সঙ্গে সামনে নিয়ে আসে মানবাধিকারের উপেক্ষা, রাষ্ট্রীয় নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ব্যর্থতা এবং বাংলায় আদিবাসী জীবনের স্বভূমি ও স্বাতন্ত্র্য হারানোর বাস্তবতা।

উপনিবেশবাদ-পরবর্তী দক্ষিণ এশিয়ার জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের মধ্যে এক ধরনের একত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরির রাজনৈতিক প্রবণতা দেখা যায়। যেখানে রাষ্ট্র সংখ্যালঘু আদিবাসীদের সমর্পণ দাবি করে এবং চাপিয়ে দেয় সংখ্যাগুরুর আধিপত্য। শুরু হয় আত্মীকরণ ও বহুত্ববাদের সংঘর্ষ। বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও জাতিচরিত্রের দক্ষিণ এশীয় সমাজ এই একত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে বারবার প্রতিহত করেছে এবং দাবি করেছে সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের। বাংলাদেশের বাস্তবতায় জাতীয়তাবাদ প্রথমে ছিল ভাষাকেন্দ্রিক এবং পরে যা হয়েছে ধর্মকেন্দ্রিক। উভয় প্রক্রিয়ায় সংখ্যাগুরুর আধিপত্য হয়েছে প্রতিষ্ঠিত এবং আদিবাসীদের জন্য তৈরি করেছে এক অসম নিরাপত্তাহীন অবস্থানের। বাংলার আদিবাসীরা একত্ববাদী, জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির বিকাশকে প্রতিরোধ করে চলেছে বারবার।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতিরাষ্ট্রের একত্ববাদী জাতীয়তাবাদের বিকাশ প্রান্তিক করেছে আদিবাসী জীবন। বস্তুতঃ 'বাঙালি' ও 'বাংলাদেশি' সব জাতীয়তাবাদই সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদ তথা গণতন্ত্রকে করেছে উপেক্ষা। যদিও সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর প্রস্তাবনা দীর্ঘ আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে আশাবাদের সঞ্চার করেছিল; কিন্তু সে আশা তিরোহিত হয় যখন আদিবাসী দাবিকে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' পরিচয়ে সীমাবদ্ধ করা হয়। একটি একত্ববাদী ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র আবারও প্রতিহত করেছে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত বহুত্ববাদের। প্রতিষ্ঠা করেছে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ।

বস্তুতঃ আদিবাসী অধিকার ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতায় দীর্ঘকাল ধরে আদিবাসীর আত্মপরিচয়ের দাবি একটি রাজনৈতিক ও বিতর্কিত বিষয়। যথাযথ রাজনৈতিক-আইনগত সিদ্ধান্তহীনতা বিষয়টিকে জটিলতর করেছে এবং অবমূল্যায়ন করেছে আদিবাসী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের। আজকের বাস্তবতায় প্রথাগত উন্নয়ন প্রকল্প ও বিশ্বায়িত আদিবাসী ডিসকোর্স আদিবাসী জীবনে পরিবর্তনের বাহক হিসেবে কাজ করছে। আর তার বাস্তবায়নের কর্ণধার হলো রাষ্ট্র। কেননা রাষ্ট্র একই সঙ্গে জাতীয় সীমানায় অধিকার প্রদান ও আইনগত স্বীকৃতির প্রাতিষ্ঠানিক মঞ্চ এবং বৈশ্বিক পরিসরে আন্তর্জাতিক অধিকারকে জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়নের প্রপঞ্চ। প্রায় তিন মিলিয়ন আদিবাসী অধ্যুষিত বাংলাদেশের আদিবাসী জীবন প্রান্তিক ও নাজুক। জাতিরাষ্ট্রের বিকাশের ধারায় একত্ববাদী জাতি গঠনের আধিপত্য আইনি স্বীকৃতি দেয়নি 'সম্প্রদায়গত সম্পত্তি মালিকানা'র। ফলে উপনিবেশবাদের ধারাবাহিকতা ও পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সম্পত্তির আইনি স্বীকৃতি ভূমিহীন করেছে আদিবসীদের কখনও আইনিভাবে আবার কখনও জোরপূর্বক জমি অধিগ্রহণে। এই ভূমি হারানো ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য হারানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করেছে আরও বেশি। কেননা আদিবাসী জীবন ও জীবিকা ভূমি তথা প্রকৃতিকেন্দ্রিক। আর এর থেকে বিচ্যুতি ও বিতাড়ন আদিবাসী জীবনকে অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সব অর্থেই অধিকারহীনতার প্রান্তসীমায় নিয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের জাতীয় বাস্তবায়ন এবং মানবাধিকারের রাজনৈতিক-আইনগত স্বীকৃতি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা ও হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। উপরন্তু রাষ্ট্রের রয়েছে সেই রাজনৈতিক ও আইনগত বৈধতা, যার কারণে সেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি, সনদ ও আইনে স্বাক্ষর করে, যোগাযোগ তৈরি করে গ্লোবাল গভর্ণ্যান্সের সঙ্গে এবং বহুপক্ষীয়-দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। একটি বহুমাত্রিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নাগরিক অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বৈশ্বিক পরিসরে কাজ করে যায়। আর তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশে যেসব আন্তর্জাতিক মানবাধিকারগুলোর সঙ্গে যুক্ত সেগুলো হলো, ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (বাংলাদেশের যুক্ত হওয়ার বছর ২০০০), ইন্টারন্যাশনাল কভেনেন্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস (১৯৯৮), ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন দ্য ইলিমিনেশন অব অল ফরমস অব রেসিয়াল ডিসক্রিমিনেশন (১৯৭৯), কনভেনশন অন দ্য ইলিমিনেশন অব অল ফরমস অব ডিসক্রিমিনেশন এগেইনস্ট ওমেন (১৯৮৪), ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট অব রোম স্ট্যাটিউট (২০১০) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ইনডিজিনাস অ্যান্ড ট্রাইবাল পপুলেশন কনভেনশন নম্বর ১০৭ (১৯৭২)।

কিন্তু বৈপরীত্য হলো এই যে, বাংলাদেশ পৃথিবীর গুটিকয়েক রাষ্ট্রগুলোর একটি যে রাষ্ট্রীয় পরিসরে অস্বীকার করেছে আদিবাসী অস্তিত্বের। রাষ্ট্রে এ আধিপত্যবাদী অবস্থান তৈরি করছে বিতর্কের, উপেক্ষা করছে আদিবাসীর আত্মস্বীকৃতির দাবিকে।

এদিকে ২০১২ সালে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় মার্চে একটি চিঠি ইস্যু করে, যা একটি বিতর্কিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সেই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, 'নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বিল-২০০৯', সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী ২০১১ তাদের আখ্যায়িত করে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী' হিসেবে এবং এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন প্রতিনিধি ও কূটনীতিকরা বিবৃত করেছেন, 'বাংলাদেশে কোনো আদিবাসী নেই।' তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয় 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' পালনে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ চিঠিটি ইস্যু করেন স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি, যা জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও ইউনিয়ন পরিষদে সার্কুলেশনের মাধ্যমে তা কার্যকর করার আদেশ দেওয়া হয়। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' পালনের এ প্রতিবন্ধকতা বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী ও দেশের প্রগতিশীল অংশকে ক্ষুব্ধ করে, তারা এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানান। এ রকম এক পরিস্থিতিতে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' পালন বাংলাদেশের আদিবাসীদের জন্য এটি আরেকটি চ্যালেঞ্জ। আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় এ প্রতিবন্ধকতা প্রান্তিকীকরণে আরও একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

বিগত প্রায় চার দশকের বাংলাদেশের আদিবাসী জীবন হলো আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার লড়াই। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে জীবনের মৌলিক অধিকারহীনতার বাস্তবতা অনেকটা এ লড়াইয়ের দৃশ্যপটের আড়ালেই থেকে যায়। বংশানুক্রমিক ভূমি হারানো, ঐতিহ্যবাহী কৃষিকেন্দ্রিক পেশা থেকে বিচ্যুতি, শিক্ষা ও কর্মের সুযোগ ও অধিকারহীনতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের প্রথাগত অধিকার থেকে বিতাড়ন বাংলাদেশের বাস্তবতায় আদিবাসী জীবনের এক করুণ দলিল। আর 'আত্মপরিচয়ের লড়াই' প্রতিরোধের সেই প্রতীকী ধরন যেখানে তারা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও জাতিগত পরিচয়ের জন্য লড়াই করে চলেছেন। যদিও বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আলোকে এ স্বীকৃতি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় একটি আধিপত্যবাদী আত্তীকরণের প্রবণতা দেখা, যেখানে সংখ্যালঘুর ওপর সংখ্যাগুরুর শাসন চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আদিবাসী জীবনের দাবি অধিকারের খণ্ডিতকরণ নয়; চাই স্বীকৃতি ও পূর্ণ বাস্তবায়ন।

লেখক: পিএইচডি গবেষক, ইউনিভার্সিটি অব হালে-ওয়িটেনবার্গ, জার্মানি, farhat718@yahoo.com

দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধটি গত ৭ আগস্ট ২০১৩ তারিখে দৈনিক সমকালে প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের জন্য পুনমুদ্রণ করা হলো।- তথ্য ও প্রচার বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাথে সেনাবাহিনীর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্যোগ প্রসঙ্গে

অনুরাগ চাকমা

কিছুদিন আগে প্রথম আলোতে প্রকাশিত প্রতিবেদন পড়ে জানতে পারলাম যে, আমাদের সবার শ্রদ্ধাভাজন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে যে গভীর অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব রয়েছে তা কিভাবে নিরসন করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন। উদ্যোগটি অত্যন্ত মহৎ এবং প্রশংসনীয়। আমিও ব্যক্তিগতভাবে এই রকম একটি উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে উপলব্ধি করছি কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে কোন চিন্তা করতে পারছি না। শুরুতেই এটাও বলে রাখা দরকার যে, আমাদের সেনাবাহিনী বহু বছর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে কিভাবে একটা সংঘাত-সংঘর্ষে জর্জরিত জনপদে শান্তির কাঠামো বিনির্মাণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট বাস্তবিক জ্ঞান ও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে যা পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে উপকারে আসতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ আমাদের সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা সংঘর্ষ ব্যবস্থাপনা ও সংঘর্ষ নিরসনের উপর অনেক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে নিজেদেরকে এ বিষয়ে অনেক সুদক্ষ করে গড়ে তুলেছেন। তাই মিজানুর রহমানের উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করার জন্য অনেক সম্ভাবনার ও আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেন সেনাবাহিনীর সাথে এই আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ? পাহাড়ী জনগণের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দদের এবং এই অঞ্চলের স্থানীয় লোকদের বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগত সমস্যার মূলে যেসব বিষয় আছে তাদের মধ্যে সামরিকীকরণ একটি অন্যতম বিষয়। জিয়া সরকার সামরিক উপায়ে এই সমস্যার সমাধান চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি পাহাড়ি জনগণ ও সেনাবাহিনীকে মুখোমুখি করে দাঁড় করিয়েছিল। ১৯৮০ এবং ৯০ দশকে যেভাবে মানুষজন নির্যাতিত হয়েছিলেন সেই ভয়াবহ স্মৃতি তাদের মাঝে এখনো সেনাবাহিনীর প্রতি ভয় ও অবিশ্বাস সঞ্চার করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা এবং পাহাড়ি জনগণেরও দেশের প্রতি টান থাকার কারণে ১৯৯৭ সালে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছিল তার মাধ্যমে পার্বত্য জনগণের সেনাবাহিনীর প্রতি যে ভীতি ও অবিশ্বাস ছিল তা কিছুটা লাঘব হয়েছে। কিন্তু চুক্তির পরেও বিভিন্ন জায়গায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলাগুলোতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের পক্ষপাতমূলক আচরণ (বিভিন্ন সময় আদিবাসী সংগঠনসমূহ অভিযোগ করে আসছে) এবং পাহাড়ি জনগণকে এসব হামলা থেকে রক্ষা করতে না পারার কারণে পাহাড়ি জনগণ এখনো সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করতে পারে না। সম্প্রতি মাটিরাঙ্গার তাইন্দং হামলার যারা শিকার হয়েছেন, সেসব অনেক পাহাড়ি মানুষ মিডিয়াকে বলেছে, 'আমরা এই বিজিবিদের বিশ্বাস করি না। তারা হামলার আগে আমাদের গ্রামে এসে আশ্বাস দিয়ে গেছে যে, কোন কিছু হবে না।' এই যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের খেলা, জনগণের জীবনের সাথে প্রতারণা এ সবকিছুর কারণে আজ এই আস্থার সংকট ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করছে।

এই অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা যেমন একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তেমনি এত বছরে জন্ম নেয়া মানসিক দূরত্বও একদিনে, একমাসে কিংবা একবছরে কমে আসবে তা প্রত্যাশা করাও অনেকটা ভুল হবে। সেজন্য ধৈর্য ধরে আমাদের সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করে যেতে হবে। আসুন আমরা সবাই অতীতকে ভুলে গিয়ে একটা সুন্দর ভবিষ্যত রচনা করি। একজন আরেকজনের গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। একজন আরেকজনকে শত্রু না ভেবে বুকে টেনে নিই। একজন আরেকজনের সুখ-দুঃখের সাথী হই। ১৯৯৭ সালে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল তার বাস্তবায়নে সবাই কাজ করি। এই অঞ্চলের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি। সহিংসতা, দাঙ্গা ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে 'না' বলি। এসবের জন্য কেবলমাত্র একটি জিনিস দরকার তা হল মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন। আমরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারি তাহলে এই অঞ্চলে আর আগামীতে রক্ত ঝরবে না, কোন শিশু এতিম হবে না, কোন বোন বিধবা হবে না, কোন মা-বাবা তাদের আদরের সন্তানকে হারাবে না, কোন গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে যাবে না। আমার মত অনেকের এই চাওয়া-পাওয়ার জন্য তেমন কিছু করার দরকার নেই। আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা হলে জনগণের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন সম্ভব বলে আমি মনে করি।

আরো বলতে চাই, সংলাপের কোন বিকল্প নেই। মারামারি, হানাহানি কোন সভ্যসমাজের সমাজ পরিচালনার নীতি হতে পারে না। আমরা যারা শান্তি ও সংঘর্ষ নিয়ে অধ্যয়ন করি আমাদের মূল বক্তব্য হল, সহিংসতা সহিংসতার জন্ম দেয়। তাই আসুন আমরা সবাই আমাদের জীবনের প্রত্যেকদিনকে শান্তিপূর্ণ করি। এটার জন্য প্রয়োজন সংঘর্ষে জড়িত গোষ্ঠী বা দলসমূহ নিজেদের উদ্যোগে গঠনমূলক আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যার সমাধান করা। তাদেরকে শান্তি প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও এখানকার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সেনাবাহিনী ও সরকারের একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এই অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে কি কি সিদ্ধান্ত হল তা (জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গোপন বিষয় ব্যতীত) জনগণকে জানানো যেতে পারে যাতে জনগণ অন্ধকারে না থাকে।

এছাড়াও আমি আরেকটি বিষয় অবতারণা করি। বিভিন্ন গবেষক ও বিশ্লেষকদের মতে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে প্রাথমিক কিছু বিষয় হাতে নিতে হয়। গেরিলাদের নিরস্ত্রীকরণ ও পুনর্বাসন করতে হয়। উদ্বাস্তু মানুষের সমস্যার সমাধান করতে হয়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে হয়। রাষ্ট্রের সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হয়। দ্বন্দ্বের মূল সমস্যাকে অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হয়। প্রশ্ন হল, আমরা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পাদনের পরে এসব বিষয়সমূহ কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছি?

পরিশেষে বলব, মিজানুর রহমান স্যারের মত পার্বত্য চট্টগ্রামে টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাবাহিনীর সাথে সংলাপে বসা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেনাবাহিনীর আন্তরিকতা ও সততা বাদে এই অঞ্চলে কখনো শান্তি বিনির্মাণ করা সম্ভব নয়। আমার ব্যক্তিগত অভিমত, সেনাবাহিনী বিভিন্নভাবে শান্তি প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে পারে যেসবের মধ্যে আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করলাম।

প্রথমতঃ সেনাবাহিনীকে সবসময় নিরপেক্ষতা বজায় রেখে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে একপেশে ইতিহাস ও প্রবন্ধ লিখেন তা পাহাড়িদের সাথে তাদের দূরত্ব সৃষ্টি করে যা বন্ধ হওয়া খুবই জরুরি। কারণ, একটি দায়িত্বশীল সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা দেশের স্বার্থে এসব বিভেদমূলক ও সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি করে এমন বক্তব্য দিতে পারেন না।

তৃতীয়তঃ সেনাবাহিনীর কিছু সদস্য যেভাবে পাহাড়ি জনগণের সাথে ঔদ্ধত্য আচরণ করে তাও বন্ধ করতে হবে। আমি দেখেছি ২০০৭/০৮ সালের জরুরি অবস্থার সময় পানছড়ি জোনে নিয়োজিত একজন সেনা কর্মকর্তা যেভাবে পাহাড়িদেরকে অপদস্ত করেছেন তা কখনো ভুলবার নয়। তিনি অনেক বয়স্ক মুরুব্বীদেরকে অকথ্য ভাষায় দুর্ব্যবহার করেছিলেন যা কোনমতে কাম্য নয়।

চতুর্থতঃ সেনাবাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকারের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল হতে হবে। অনেকের মত ব্যক্তিগতভাবে আমিও মনে করি আমাদের বর্তমান সেনাবাহিনী অনেক সুশৃঙ্খল সুশিক্ষিত এবং সুদক্ষ একটা সেনাবাহিনী যার আন্তর্জাতিকভাবে আলাদা একটা সুনাম ও বিশেষ পরিচিতি আছে। আন্তর্জাতিকভাবে এই সুপরিচিতি এবং খ্যাতি যাতে কোনমতে বিনষ্ট না হয় তার জন্য সেনাবাহিনীকে আরো অনেক সংযত ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। রাষ্ট্রের একটা দায়িত্বশীল বিভাগ হিসেবে এই বাহিনীকে যাতে কোন গোষ্ঠী তাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য সতর্ক হতে হবে। তাদেরকে রাষ্ট্র যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা নিরপেক্ষতার সাথে পালন করতে হবে।

প্রত্যাশা করি, আমাদের পাহাড়ি জনগণের সাথে সেনাবাহিনীর যে ভুল বুঝাবুঝি ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব রয়েছে তার সম্মানজনক সমাধান হবে এবং দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হবে। এতটুকু আশা করতে পারি এই কারণে, যেহেতু আমরা সবাই এই দেশের নাগরিক, কেউ কারোর প্রতিপক্ষ নই। তাই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ভুলে গিয়ে আমরা সবাই মিলেমিশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে দেশ গড়ার কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োজিত করি।

[লেখক: প্রভাষক, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

দ্রষ্টব্য: প্রবন্ধটি গত ২৯ আগস্ট ২০১৩ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকের অনুমতি নিয়ে পুনর্মুদ্রণ করা হলো।- তথ্য ও প্রচার বিভাগ

> ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম হল বিভিন্ন জাতিসত্তার ইতিহাস। কেমন করে সেই ইতিহাস আমাদের সংবিধানের পাতায় স্থান পেল না, তা আমি ভাবতে পারি না। সংবিধান হচ্ছে এমন একটা ব্যবস্থা, যা অনগ্রসর জাতিকে, পিছিয়ে পড়া, নির্যাতিত জাতিকে, অগ্রসর জাতির সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে নিয়ে আসার পথ নির্দেশ করে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে এই পেশকৃত সংবিধানে আমরা সেই রাস্তার সন্ধান পাচ্ছি না।’
>
> **—মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা**

তাইন্দং-এ ফিরে আসে যশোর রোড ১৯৭১

দীপায়ন খীসা

মাটিরাঙ্গার তাইন্দং। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার একটি দূরবর্তী জনপদ। ফেনী নদীর উৎসমুখে ভারত সীমান্তবর্তী একটি ইউনিয়নের নাম তাইন্দং। ৩ আগস্ট-এর পর হতে তাইন্দং নামটি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে আসতে শুরু করে। দেশবাসী তাইন্দং নামটির সাথে পরিচিত হতে শুরু করে। তবে তাইন্দং এর নামটি এই সংবাদ মাধ্যমে উঠে আসা, দেশবাসীর পরিচিত হওয়ার সাথে আবও অনেক কিছুই আমদের মাঝে উঠে আসতে শুরু করে। আমরা দেখি ফেনী নদী পার হয়ে ওপারে ভারতীয় সীমান্তের কাছ ঘেঁষে হাজারো গৃহহীন মানুষ। আরও দেখি বাংলাদেশ সীমান্তের ফেনী নদীর এপার থেকে এই গৃহহীন মানুষদের নিজ দেশে ফেরত আসার আহ্বান করছেন এই দেশেরই এক মন্ত্রী। সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে আরও দেখেছি দীর্ঘ সারিবদ্ধ নর-নারী, শিশু, প্রৌঢ় সবাই মাথায়, পিঠে কিংবা কাঁধে সংসারের বোঝা নিয়ে কোথায় যেন ছুটছে? বেঁচে থাকার আশায়, একটু নিরাপত্তার খোঁজে তাদের এই দীর্ঘ সারিবদ্ধ পথ চলা। ভিটেমাটি হারিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে খোঁজা তাইন্দং-এর মানুষদের একটাই অপরাধ তারা জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি নয়। তারা ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন সংস্কৃতির। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় তারা এই বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের যে পরিচিতি অর্থাৎ তাইন্দং-এর আক্রান্ত মানুষেরা বাঙালি মুসলমান নন। সেই কারণে আগুনে পোড়ানো হয় তাদের বসতি, চালানো হয় লুটপাট, পরিচালিত হয় ধ্বংসযজ্ঞ। সেই সাথে আক্রান্ত হয় নির্যাতিত মানুষের ধর্মবিশ্বাসও। অহিংস মন্ত্রের প্রতীক গৌতম বুদ্ধের মূর্তিও ভেঙ্গে-চুড়ে খান খান হয়ে যায়। এইভাবে পদদলিত হয় মানবতা, তাইন্দং-এর মানুষেরা তাই হাঁটতে শুরু করে একটু নিরাপত্তার সন্ধানে।

এই পথ চলাতো বন্ধ হওয়ার কথা ছিল ১৯৭১-এর পর। আরেকটু যদি সামনে চলে আছি, তা হলে বলতে হয় ১৯৯৭-এর পাহাড়ের জুম্ম জনগণ এইভাবে পথ হাঁটবে, ফেনী নদী পাড়ি দেবে সে কথাতো ছিলো না। কিন্তু রাষ্ট্রতো কথা রাখেনি। তাইতো যশোর রোড বারবার ফিরে আসে তাইন্দং এবং ফেনী নদীর তীরবর্তী জনপদে। ১৯৮১, ৮৬, ৮৮-৮৯ তাইন্দং-এর মানুষের জন্য জীবনের গল্প ছিল একটাই। সেটা হচ্ছে ১৯৭১-এর সেই যশোর রোড। তারপর রাষ্ট্রের আশ্বাসের কারণে ফিরে আসা। ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তি, ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি। তাই আবার স্বদেশ, প্রিয় মাতৃভূমিতে নতুন জীবনের স্বপ্ন বুনা। ফেনী-গোমতী আর তাইন্দং-এর অববাহিকায় আবার শুরু হয় নতুন জীবনের পথ চলা। জীবনকে নিজেদের করে নেয়ার লক্ষে এক সম্ভাবনার জগত বিনির্মাণের পথে আরেকবার হোঁচট। ৩ আগস্ট ২০১৩ আবারও সেই বিভিষীকা'র পুনরাবৃত্তি। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে একটি ভয়াবহ বার্তা রাষ্ট্র বার বার পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছে, জীবন এখনও তোমাদের নয়।

৩ আগস্ট ২০১৩ তাইন্দং-এর পাহাড়ী আদিবাসী মানুষদের জীবনে জাতিগত নিপীড়নের আরেক ভয়াবহ স্মৃতি যোগ হলো। খাগড়ছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার জনমিতির চিত্র পরিবর্তন হয়েছে অনেক আগে। পাহাড়ের ভূমিজ সন্তান জুম্ম জনগণ এখন সেখানে সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। সেখানে সর্বত্রই দখলদারদের বিজয়চিহ্ন। জাতিগত নির্মূলীকরণের এই ভয়াবহ তত্ত্ব থেকে রাষ্ট্র এখনও বেরিয়ে আসতে পারছে না। এথনিক ক্লিনজিং-এর সফল এই প্রয়োগে মাটিরাঙ্গায় এখন অভিবাসিত মানুষেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙালি সেটলার বলে পরিচিত এই অভিবাসীদের দাপট সমগ্র মাটিরাঙ্গা জুড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সর্বত্রই তাদের দাপুটে উপস্থিতি। আদিবাসী পাহাড়ীদের যেটুকু ভিটেমাটি ও জায়গাজমি রয়েছে সেগুলোর প্রতি তাই এই অভিবাসীদের লোভাতুর দৃষ্টি। এই দখলী আয়োজনে সহায়ক হচ্ছে রাষ্ট্রের সেই সর্বনাশা তত্ত্ব। জাতিগত নির্মূলীকরণের সর্বশেষ প্রয়োগ হচ্ছে মাটিরাঙ্গার তাইন্দং। অবশ্য মন্ত্রীর আহ্বানে, স্থানীয় প্রশাসনের আশ্বাসের প্রেক্ষিতে নোম্যানস ল্যান্ড থেকে এবং নিরাপত্তার অভাবে বনে বাঁদাড়ে পালিয়ে থাকা মানুষেরা আবার ভিটেমাটিতে ফিরে আসতে শুরু করে। কিন্তু পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ী, লুটপাটে সর্বশান্ত হওয়া জীবন কিভাবে ফিরে পাবে তাইন্দং-এর আদিবাসী মানুষেরা? এখনও আক্রান্ত মানুষেরা নিরাপদে সওদা নিয়ে হাট-বাজারে যেতে পারছেনা। শিক্ষার্থীরা যেতে পারছে না তাদের শ্রেণীকক্ষে। আতংক আর খোলা আকাশের নীচে জীবনই কি তাহলে আদিবাসী জনগণের জন্য এই রাষ্ট্রের উপহার? আমরা দেখেছি রামুর বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসের পর আবারও সেই বিহারগুলো পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই পুনর্নির্মিত বিহারগুলি উদ্বোধন করেছেন। তাইন্দং-এর ক্ষতিগ্রস্ত ২টি বৌদ্ধ বিহার কি রষ্ট্র পুনর্নির্মাণ করে দিতে পারে না? এই ক্ষেত্রেও একটি মনস্তত্ব কাজ করে। সেই মনস্তত্ব হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠের মনস্তত্ত্ব। রামুর আক্রান্ত বৌদ্ধ বিহারগুলোর উপাসক কিংবা উপাসিকারা বাঙালি বৌদ্ধ। আর তাইন্দং-এর বৌদ্ধবিহার দুটি হচ্ছে অবাঙালি বৌদ্ধদের। পার্বত্য এলাকায় বৌদ্ধ বিহার আক্রমণ বা ধ্বংস করার বিষয়টি নতুন নয়। সশস্ত্র যুদ্ধের সময়কালীন সময়ে এটিও একটি নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক এথনিক ক্লিনজিং-এর যে আগ্রাসী কর্মসূচী, পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহার আক্রমণ করা তারই একটি অংশ মাত্র।

তাইন্দং জনপদে হামলার পর পাহাড়ে আর কোনো জতিগত হামলা পরিচালিত হবে না, সেই আশ্বাস রাষ্ট্রকে অবশ্যই দিতে হবে। ধর্ম ও জতিগত এবং ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে রাষ্ট্রের কোন নাগরিকের নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। ক্ষুদে শিক্ষার্থী

#৪৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

বিজ্ঞজনের অর্বাচিনসুলভ বক্তব্য অনভিপ্রেত

সত্যবীর দেওয়ান

অস্তিত্বের লড়াই বনাম বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র

এটা আমাদের অস্তিত্বের লড়াই, শাসকগোষ্ঠী যে দলেরই হোক না কেন, তারা চায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকতে এবং ক্ষমতার যথেচ্ছা ব্যবহার করে এক সময় আমাদের অস্তিত্বকে বিলীন করে দিতে। তারা চায় আমাদেরকে তাদের অনুগত গোলামের মত অনুগ্রহভাজনরূপে দেখতে, দেশের মৌলিক নাগরিক অধিকার ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে নয়। অথচ আমরা চাই সসম্মান অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে। আমরা আমাদের মতো করে নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং জীবন বোধ নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। আমাদের এই চাওয়া হচ্ছে দেশের একজন নাগরিক যে মৌলিক অধিকার ভোগ করে ঠিক ততটুকু। আর এই চাওয়াটা হচ্ছে-স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের মৌলিক ভিত্তি হচ্ছে তার অধিকারের ন্যায়সঙ্গত চরিত্র। আর আন্দোলনের এই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত চরিত্রের কারণে দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিক সশস্ত্র আন্দোলন চলা সত্ত্বেও এই আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে সরকার আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণ করতে পারেনি। একই কারণে দেশের মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন জনগণের যেমনি আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে, তেমনি বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী দেশ, সংস্থা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের মানবতাবাদী সংগঠনসমূহের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভে সক্ষম হয়েছিল।

পক্ষান্তরে শাসকগোষ্ঠীর কিছু প্রতিক্রিয়াশীল, সম্প্রসারণবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনসমূহ প্রতিনিয়ত জুম্ম জনগণকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে জুম্ম জনগণের অস্তিত্বকে চিরতরে বিলুপ্তির জন্য একটির পর একটি ধারাবাহিক ও পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চালিয়ে আসছে। একদিকে সাম্প্রদায়িক সহিংসতা অন্যদিকে জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ করে ভূমি বেদখলের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। বিগত ২০০৭ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পূর্বে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোটের শাসন আমলে খাগড়াছড়ি জেলার মাইচছড়ি, লেমুছড়ি ও মহালছড়ির সাম্পদায়িক সহিংসতা, তেমনি ফখরুদ্দীনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাঘাইছড়ির বাঘাইহাট, সাজেক এলাকা পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তেমনি বর্তমান শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শাসনকালেও সর্বশেষ ঘটনা গত ৩ আগস্ট ২০১৩ তাইন্দং এলাকার সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা। সরকারী তদন্ত প্রতিবেদন ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ প্রথম আলোতে প্রকাশিত হয়েছে। "অপহরণ নাটক সাজিয়ে পাহাড়িদের ওপর হামলা" শিরোনামে লিখিত প্রতিবেদন অনুযায়ী কথিত কামাল হোসেন নামক ব্যক্তি নিজের মুঠোফোনে তার অপহরণের কথা সাজিয়ে যে নাটক সংঘটিত করে তাতে ৩৮টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, ৩৩৫টি বাড়ি ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়েছে বলা হয়েছে। আতঙ্কে ৫৪১টি পরিবার এলাকা ছেড়েছে। ১২ জন আদিবাসীকে বেধড়ক মারধর করে আহত করা হয়েছে।

ঘটনায় কোন বাঙালি আহত হয়নি। পুলিশ ও বিজিবি একটি গুলিও ছোড়েনি, লাঠিপেটা করেনি। তারা সশস্ত্রাবস্থায় নির্বিকার ছিল। এই তদন্ত প্রতিবেদনই সাক্ষ্য বহন করে যে, প্রশাসন নিরপেক্ষ ছিল না। একইভাবে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ মধ্যরাতে রামুর বৌদ্ধ পল্লীতে একই প্রকারের সাজানো নাটকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সহিংস হামলা। একইভাবে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটিতে সাম্প্রদায়িক সহিংস হামলার ঘটনায় প্রমাণ করে যে, সরকারী প্রশাসন ধর্ম-নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এসমস্ত ঘটনার নেপথ্যে শাসকগোষ্ঠীর একটি মহল বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন মহলটি প্রত্যাক্ষ বা পরোক্ষভাবে না থাকলে এতসব মানবতা বিরোধী ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটতে পারতো না। তেমনি প্রশাসন নিরপেক্ষ না হলে আগামীতেও দেশের সাম্প্রদায়িক মানসিকতাসম্পন্ন সংগঠন, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানসমূহ বার বার এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে। কারণ এদের উদ্দেশ্য হচ্ছে-জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ করে ভূমি বেদখল এবং অধিকতর সংখ্যালঘুতে পরিণত করে পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি অধ্যুষিত এলাকার মর্যাদাকে বিলোপ সাধন করা। যে কারণে তিন পার্বত্য জেলার স্থায়ী অধিবাসী নয় এমন ১৭৯৯ জনের নামে ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ) হাজার একর জমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে। (সূত্র-দৈনিক যুগান্তর, ২১/০৭/২০০৯) তাতে কেবলমাত্র তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মে. জে. (অব) আব্দুল মতিনসহ তার আত্মীয় স্বজনদের নামে ২৬৫ (দুইশত পঁয়ষট্টি) একর ভূমি বন্দোবস্তী নেয়া হয়েছে। সরকার এসব ইজারা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে উক্ত সংবাদে লেখা হয়। কিন্তু এসব ইজারা আদৌ বাতিল করা হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি নিয়ে মতভেদ ও সংঘাত

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির পরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও তার আওতাধীন শান্তিবাহিনী ১৯৯৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি হতে ৫ মার্চের মধ্যে যাবতীয় অস্ত্র-গোলাবারুদ সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। চুক্তিকে নিয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদে মতভেদ দেখা দেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পার্বত্য চুক্তিকে মেনে নিলেও পরিষদের বিভেদপন্থী অংশ প্রকাশ্যে বিরোধীতা প্রদর্শন করে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ এর অস্ত্র সমর্পনের অনুষ্ঠানে কালো পতাকা

প্রদর্শন করে এবং পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের শ্লোগান নিয়ে মাঠে নামে। আর চুক্তি বাস্তবায়নের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করে। রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলায় কতিপয় উপজেলায় যত্রতত্র চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস, অপহরণ বাণিজ্য শুরু করে সাধারণ জনগণ, প্রত্যাগত জেএসএস সদস্যসহ পাহাড়ি-বাঙালি এমনকি বিদেশী অপহরণ করে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে বিষোদগার স্বরূপ মিথ্যা অপপ্রচার করতে শুরু করে এবং রাজনৈতিক সংগঠনের নাম দেয় ইউপিডিএফ। নাম দিয়েছে রাজনৈতিক পার্টি কিন্তু কার্যকলাপে আপাদমস্তক জন্মলগ্ন হতে সন্ত্রাসী।

আজ ১৬ বছর ধরে প্রচার করে আসছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন করে তারা পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করবে বলে চুক্তিবিরোধী ভূমিকার মাধ্যমে সংঘাতময় সন্ত্রাসবাদী পথ গ্রহণ করেছে। চুক্তির পরে নতুন করে সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। তাই সংঘাত তারাই বন্ধ করতে পারে যারা সৃষ্টি করেছে। তাদের সন্ত্রাসের রাজত্বকে যেন প্রশাসন লাইসেন্স দিয়েছে, সাধারণ পাহাড়ি কোন ব্যক্তিকে অপহরণ করলে সেটা তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে প্রশাসন কর্তৃক উদ্ধার কাজে নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শন করা হয়। আর কোন বাঙালি অপহৃত হলে ২৪/২৮ ঘন্টার মধ্যে অপহৃতকে প্রশাসন উদ্ধার করে আনে। আর কোন পাহাড়ি অপহৃত হলে প্রশাসন বলবে এটা পাহাড়িদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। মাসকে মাস অপহৃত ব্যক্তিকে বন্দী রেখে লক্ষ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করে নেয়া হচ্ছে। প্রশাসনকে অবহিত করে এজাহার দিয়ে থাকলেও মুক্তিপণ ব্যতীত কাউকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে না। আর ইতোমধ্যে জেএসএস সদস্যসহ তিন শতাধিক নিরীহ জুম্মকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। এদিকে জনগণের এসব সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে নাভিশ্বাস উঠেছে। আত্মরক্ষার জন্য জনগণ দিশেহারা হয়ে সর্বশেষ সংগঠিত হয়ে নিজেরাই সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। তাতে শত শত জনগণকে আত্মাহুতি দিতে হচ্ছে। যেহেতু সরকারী প্রশাসন জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ, অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের ছত্রছায়ায় তথা প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা অপহরণ বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে জনগণ নিজেরাই সংগঠিত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় সন্ত্রাস প্রতিরোধ সংগঠন গড়তে বাধ্য হয়েছে। কাজেই জনগণের এই সন্ত্রাস প্রতিরোধ সংগ্রাম হচ্ছে তাদের আত্মরক্ষার সংগ্রাম। জনগণের এই সন্ত্রাস প্রতিরোধ করে আত্মরক্ষার সংগ্রামকে কিছু শিক্ষিত মহল ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। যা আদৌ ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত নয়। এটা কার্যতঃ জনগণের আত্মরক্ষার সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস প্রতিরোধ সংগ্রাম ব্যতীত কিছুই নহে।

আর অনেক উচ্চ শিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত জুম্ম কর্মকর্তা বিভিন্ন সভায় চুক্তিপক্ষ বিপক্ষের সংঘাত, জেএসএস ও ইউপিডিএফ এর ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। যারা এরূপ বক্তব্য রাখছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলতে চাই তাদের সেসব বক্তব্য আবেগপ্রসূত, বাস্তবসম্মত নয়। আর জেএসএস পার্বত্য চুক্তির মাধ্যমে তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করে। সম্পূর্ণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিয়ে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। যা বর্তমানে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন হিসেবে পরিচালিত হয়ে আসছে। পার্বত্য চুক্তির পরে ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ হতে ৫ মার্চ এর মধ্যে যাবতীয় অস্ত্র গোলাবারুদ জমা দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জেএসএস তার আওতাধীন সশস্ত্র শান্তিবাহিনীর বিলোপ ঘোষণা করেছে। সেদিন থেকে জেএসএস সশস্ত্র সংঘাতের পথ পরিহার করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন করে যাচ্ছে। কাজেই জেএসএসকে এখন সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানানো অবান্তর ও অযৌক্তিক। তবে খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কতিপয় উপজেলায় ইউপিডিএফসহ তাদের কতিপয় সংগঠনের সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সেসব এলাকায় জনগণ আত্মরক্ষার জন্য সন্ত্রাস প্রতিরোধ সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়েছেন। আর এটা অত্যন্ত বাস্তব যে, সন্ত্রাসবাদী ইউপিডিএফ যতদিন না পর্যন্ত তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে মুক্তিপণ, হত্যা, গুম, অপহরণ বাণিজ্য বন্ধ করবে না, জনগণকে ততদিন পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য সন্ত্রাস প্রতিরোধ সংগ্রাম করে যেতে হবে। এছাড়া জনগণের আত্মরক্ষার কোন পথ নেই। কারণ সরকারি প্রশাসন জনগণের নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ। এ কারণে জনগণের আত্মরক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই নিতে হচ্ছে। এটাই বাস্তবতা। তাই জনগণের এই আত্মরক্ষার জন্য সন্ত্রাস প্রতিরোধ সংগ্রামকে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত রূপে ব্যাখ্যা করা অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন।

ভুল ও নির্ভুলের, সঠিক ও বেঠিকের সমঝোতার দর্শন

অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সঠিক ও নির্ভুল রাজনৈতিক লাইন অনুসরণই উত্তম পন্থা, সে পথ যত কঠিন ও নির্মম হোক না কেন আর ভুলের সাথে নির্ভুলের, সত্যের সাথে মিথ্যার সমঝোতা হয় না এবং হতে পারে না। যা বাস্তবসম্মত যুক্তির বিচারে সঠিক ও নির্ভুল তাই যুক্তিসঙ্গত।

যুগে যুগে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যেমনি সংগ্রাম করেছে, তেমনি সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মানব সমাজকে সমাজের আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার ভুল চিন্তা, ভুল কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করতে হয়েছে। সকল প্রকার ভ্রান্ত পথ ও মতের বিরুদ্ধে যুগে যুগে মহামনীষী দার্শনিকগণ বিজ্ঞানসম্মত যুক্তির ভিত্তিতে সংগ্রাম করে মানব সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। মানব ইতিহাসের মহান ও চিরস্মরণীয় মহামনীষীগণ তাদের সেই সময়ের সঠিক ও নির্ভুল কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে যাবতীয় অন্যায় অবিচার, মিথ্যা ও ভুলের বিরুদ্ধে আজীবন আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করেছেন। এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন, সফল হয়েছেন। তাদের সেই সফলতার পিছনে ছিল সঠিক ও নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী এবং রূঢ় বাস্তবতার বিরুদ্ধে ক্লান্তিহীন অবিরাম সংগ্রাম পরিচালনার মানসিক দৃঢ়তা। এই সংগ্রাম তারা কেউ এককভাবে করেননি, সংগঠিতভাবে করেছেন এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন দৃঢ়তার সাথে।

প্রাচীন বাংলার একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা"। পৃথিবীকে ভোগ করতে গেলে অর্থাৎ পৃথিবীতে নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে বেঁচে থাকতে গেলে বীর জাতি হতে হয়। বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করতে হয়। তাই এটা সংগ্রামের প্রশ্ন

এটা হিংসার নয়। যারা সংগ্রামে ভীরু তারা এটা হিংসার বলে চালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। যে জাতি ভীরু, কাপুরুষ, সংগ্রাম বিমুখ সে জাতির পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। তাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেটা তাদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ পরিণতি। আর যে জাতি নিজের স্বকীয়তা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়, সে জাতিকে সংগঠিত হয়ে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস-প্রচেষ্টার মাধ্যমে সঠিক ও নির্ভুল রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ করে এগিয়ে যেতে হবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। জুম্ম জনগণের পক্ষে দীর্ঘ তিন যুগ সশস্ত্র সংগ্রামের পর ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি দুই যুগের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফসল। কেবল চুক্তি করলেই হয় না, চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য। চুক্তি করতে যে ত্যাগ জুম্ম জনগণকে করতে হয়েছে, চুক্তি বাস্তবায়নে আরও অধিকতর ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই জুম্ম জনগণকে নেতৃত্বদানকারী পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে এই চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার কোন যুক্তি নেই। ঐ সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার অর্থ হবে শত সহস্র কর্মী ও জনগণের রক্তের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। তাই জেএসএস এর কাছে চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রাম করে যাওয়াই সঠিক সিদ্ধান্ত। যেহেতু পার্বত্য চুক্তিতে জুম্ম জনগণের আইন পরিষদ সম্বলিত স্বায়ত্তশাসন আসেনি ঠিকই, তবে পার্বত্য চুক্তিতে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার মত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। তাতে জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার ন্যূনতম অধিকার রয়েছে। কেবল বাস্তবায়নের সমস্যাটি হচ্ছে প্রধান সমস্যা।

এটা অত্যন্ত বাস্তব যে, একই সময়ে দুই বিপরীত মত কখনই সঠিক হতে পারে না। তাই আমাদের সর্বস্তরের শিক্ষিত মহলের অত্যন্ত গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা উচিত যে চুক্তি বাস্তবায়নের দর্শন সঠিক? নাকি বিরোধিতার দর্শন সঠিক? কোনটি যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত, বিবেক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা একান্তই প্রয়োজন। তাই কেবল আবেগের বশবর্তী হয়ে অযাচিত মন্তব্য করা অনুচিত। বিশেষ করে যারা দীর্ঘ ৪২ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে বাস্তবতার কারণে কোন প্রকার ভূমিকা রাখতে পারেননি, তাদের মধ্যে যারা চুক্তি বাস্তবায়ন চান, চুক্তিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন, তাদের বরং এখন যথার্থ সময় এসেছে-চুক্তি বাস্তবায়নে যৎকিঞ্চিত হলেও অবদান রাখার। কারণ শুধু মুখে মুখে সমর্থন করা যথেষ্ট নয়। এখানে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রশ্ন আসে। বিনা সংগ্রামে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন হবেনা। এটা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। ইতিহাসের নির্মম সত্য হচ্ছে অধিকার কেউ কাউকে দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীল সংগ্রামই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

আর একটি কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, একই সময়ে দুইটি পরস্পর বিরোধী মত কখনই সত্য হতে পারে না। তাই চুক্তি বাস্তবায়নের তত্ত্ব কি সঠিক? না চুক্তি বিরোধীতার তত্ত্ব সঠিক? কোনটি সঠিক এটি বাস্তবতার আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে গ্রহণ বা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, অন্যথায় দিকভ্রান্ত হতে বাধ্য। তাই দুই বিপরীত মেরুকে একটি পথে টানতে গেলে তখন সঠিক পথধারীকে ভুল পথে আসতে হবে অন্যথায় ঐক্য অসম্ভব। কিন্তু সঠিক পথ অনুসারী কোন প্রকারেই সচেতনভাবে ভ্রান্তপথে যেতে পারে না এটা হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত বাস্তবতা। তাই ভ্রান্তপথের অনুসারী যদি সঠিক পথে ফিরে আসে কেবল তখনই ঐক্য সম্ভব। কথা হচ্ছে ভ্রান্তপথের অনুসারী যদি সচেতনভাবে স্বার্থগত কারণে ভ্রান্তপথকে আকড়ে ধরে থাকতে চান তখন ঐক্যের অন্তরায় হতে বাধ্য। অথচ আমাদের জুম্ম নাগরিক সমাজে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তি আছেন যারা সঠিক ও ভ্রান্তপথের মধ্যে সমঝোতার তত্ত্ব খুঁজে পান যা বোধগম্য নয়।

আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উচ্চ শিক্ষিত অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীজীবি (কর্মকর্তা) আলাপছলে বলেছেন, সরকার যখন চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না তখন জেএসএস এর চুক্তিবিরোধীদের সাথে এক সঙ্গে আন্দোলন করা দরকার। তিনি কথাটি এত সহজভাবে বলেছেন সমস্যাটি যে তত সহজ নয় এটা তার উপলব্ধির বাইরে একেবারেই পরিষ্কার। তাই তিনি উচ্চ শিক্ষিত হলেও বাস্তবে তাঁর রাজনৈতিক চেতনার গভীরতা কতটুকু এটা আমার জানা হয়ে গেছে। তিনি আগাগোড়ায় যে অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এটা অত্যন্ত পরিস্কার।

যেহেতু দুই যুগের অধিক কাল ধরে রক্তাক্ত সংগ্রামের পর এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যে চুক্তি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত ও সমর্থিত হয়েছে, সেই চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত জুম্ম জনগণের সংগ্রাম করে যাওয়ার বৈধ অধিকার রয়েছে। অতএব উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞজনদের অর্বাচিনসুলভ মন্তব্য শুধু অযাচিত নয়, অনভিপ্রেতও বটে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা

সমীচিন চাকমা

২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইসতেহারে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী বিষয়ে অনেক অঙ্গীকার করা হয়েছে। 'দিন বদলের সনদ' নামে নির্বাচনী ইসতেহারে আওয়ামীলীগ উল্লেখ করেছিল যে-

"১৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চল-

১৮.১ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৮.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে। বস্তি, চর, হাওড়, বাওড় ও উপকূলসহ সকল অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।"

উপরোক্ত নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে অন্যতম ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা। সরকার বরাবরই দাবি করে আসছিল যে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী দীপংকর তালুকদারসহ সরকারের অনেক মন্ত্রী-আমলা এও দাবি করেন যে, সরকার ইতিমধ্যে চুক্তির অধিকাংশ বিষয় বাস্তবায়ন করেছে। কিন্তু কার্যতঃ সরকার কতটুকু চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিল বা চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের উদ্যোগ কেমন ছিল তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

কমিটি পুনর্গঠন ও বিভিন্ন পদে নিয়োগ

ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরে চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ হিসেবে সরকার কতিপয় কমিটি পুনর্গঠন বা কমিটির উচ্চ পদে দলীয় সাংসদ বা নেতা-কর্মীদের নিয়োগ প্রদান করে। যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক পদে সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, টাস্কফোর্স চেয়ারম্যান পদে (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে) খাগড়াছড়ি নির্বাচিত সংসদ সদস্য যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে (প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে) বান্দরবান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হিসেবে রাঙ্গামাটি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে নিয়োগদান উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ এসব কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হলেও কমিটিগুলোর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ৫টি সভা অনুষ্ঠিত হলেও চুক্তি বাস্তবায়নে এ কমিটি কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি। প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদে এম.পি যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরার নিয়োগ দেয়া হলেও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও প্রত্যাগত শরণার্থী স্ব স্ব বাস্তুভিটায় পুনর্বাসনের কাজ মোটেও অগ্রগতি লাভ করেনি। বিশেষ করে বিগত ৫ বছরে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। বান্দরবান থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বীর বাহাদুরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হলেও চুক্তির বিধান অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এ বোর্ড পরিচালিত হয়নি। উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিষদকে অন্ধকারে রাখা হয়েছে। পূর্বের মতো এ সরকারের আমলেও উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করার নীতি অব্যাহতভাবে অনুসৃত হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ প্রদান করা হলেও তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ না দিয়ে নানা বিতর্কিত কার্যক্রম শুরু করে। তিনি কমিশনের সদস্যদের সাথে আলোচনা না করে রাজনৈতিক নেতার মতো তিন জেলায় সফর করে সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন ব্যক্তিদের সাথে এককভাবে সভা অনুষ্ঠিত করা, প্রচারণামূলক পদযাত্রা ও জনসভা আয়োজন করা, একতরফাভাবে ভূমি জরিপ ঘোষণা, কমিশনের সিদ্ধান্ত ছাড়াই ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তির জন্য দরখাস্ত

আহ্বান করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা, এককভাবে শুনানী শুরু করা ইত্যাদি কার্যক্রমে লিপ্ত হন। ফলে তাঁর আমলে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কাজ একবিন্দু তো এগোয়নি, উপরন্তু তিনি পুরো ভূমি কমিশনকে বিতর্কিত করে তোলেন। অধিকন্তু সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনে চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। শেখ হাসিনা সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার আসীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনের কাজ শুরু হয়। বিগত ৫ বছরে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একের পর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি সর্বশেষ মন্ত্রীসভা ও জাতীয় সংসদেও উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সর্বশেষ সরকার এই আইন সংশোধনের কাজ ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে। দীর্ঘ ৫ বছরেও এ ভূমি কমিশন আইনটি সংশোধন না করা চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতার অন্যতম দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ শাসনব্যবস্থা

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের বিধান করা হয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের পর এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বর্তমান মহাজোট সরকারের বিগত ৫ বছরে স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন বিধিমালা ও ভোটার তালিকা বিধিমালা প্রণয়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ক্ষমতাসীন দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য পদে মনোনয়ন দিয়ে অন্তর্বর্তী জেলা পরিষদসমূহ অগণতান্ত্রিকভাবে বছরের পর বছর ধরে পরিচালিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোকে অথর্ব ও অকার্যকর অবস্থায় রাখা হয়েছে।

একইভাবে বিগত পাঁচ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্যবিধিমালা চূড়ান্ত হয়নি। চুক্তিতে বর্ণিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অধ্যুষিত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের বিধানটি লঙ্ঘিত হচ্ছে প্রতি পদে পদে। অব্যাহতভাবে সমতল অঞ্চল থেকে বহিরাগতরা পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকছে ও বসতি গড়ে তুলছে। তারা পাহাড়িদের জায়গা-জমি জবরদখল করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল চাকুরীতে পাহাড়ীদের অগ্রাধিকার দিয়ে স্থায়ী অধিবাসীদের নিয়োগের বিষয়টি প্রতিটি ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করে বহিরাগতদের নিয়োগ দেয়া হচ্ছে।

অস্থায়ী ক্যাম্প ও অপারেশন উত্তরণ প্রত্যাহার

ক্ষমতায় আসার পর সরকার কাপ্তাই ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারসহ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হলেও তারপর থেকে চুক্তি অনুসারে অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহারের কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এমনকি ২০০১ সালে জারীকৃত একপ্রকার সেনাশাসন 'অপারেশন উত্তরণ' প্রত্যাহারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে পূর্বের মতো পার্বত্য চট্টগ্রামে বাহ্যতঃ সিভিল প্রশাসন বলবৎ থাকলেও অপারেশন উত্তরণের বদৌলতে কার্যতঃ সেনাবাহিনীই সব কিছু কর্তৃত্ব করে চলেছে।

পার্বত্য জেলা পরিষদে বিষয় হস্তান্তর

এ সরকারের আমলে ইতিপূর্বে হস্তান্তরিত বিভাগের ৫টি কর্ম/প্রতিষ্ঠান তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করেছে। যেমন- হস্তান্তরিত কর্ম/প্রতিষ্ঠানগুলো হলো স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ বিভাগের অধীন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কৃষি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ও তুলা উন্নয়ন বোর্ডের খাগড়াছড়ি কার্যালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিভাগের অধীন রামগড় মৎস্য খামার (হ্যাচারি) এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের অধীন সরকারি শিশু সদন। মূল বিষয় যেহেতু হস্তান্তর হয়ে গেছে সেহেতু মূল বিভাগের অধীন সকল স্তরের প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, জনবল, কর্ম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন হয়ে যায়। অথচ সরকার এটাকে এমন ঘটা করে চুক্তি স্বাক্ষর করে হস্তান্তর করলো যা দেখে মনে হবে সরকার নতুন একটি বিষয় (বিভাগ) হস্তান্তর করেছে। কিন্তু কোন পূর্ণাঙ্গ বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সরকারের আমলে হস্তান্তরিত হয়নি। যেমন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ (স্থানীয়), ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, মাধ্যমিক ও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, রক্ষিত নয় এমন বন, পরিবেশ, স্থানীয় পর্যটন, জুমচাষ ইত্যাদি হস্তান্তরের কোন কার্যকর উদ্যোগ বিগত পাঁচ বছরে নেয়া হয়নি। অথচ এসব বিষয় হস্তান্তরের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সম্বলিত বিশেষ শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

উপরোক্ত ৫টি কর্ম/প্রতিষ্ঠান হস্তান্তরের ফলে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ২৩টি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ২২টি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে ২১টি বিষয় হস্তান্তর করা হয়ে গেছে বলে সরকার যে দাবী করছে তা সঠিক নয়। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের প্রথম তফসিলে তালিকাভুক্ত পরিষদের কার্যাবলীতে যে ৩৩টি বিষয় উল্লেখ রয়েছে তদনুসারে ধরলে এযাবৎ মাত্র ১২টি বিষয় (বিভাগ) তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুক্তির সাংবিধানিক হেফাজত

মহাজোট সরকার গত ৩০ জুন ২০১১ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী জাতীয় সংসদে পাশ করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিসহ আপামর পার্বত্যবাসী ও দেশের গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক নাগরিক সমাজের দাবী ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির আলোকে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনগুলোর আইনী হেফাজত প্রদানের লক্ষ্যে সংবিধানের প্রথম তফসিলে 'কার্যকর আইন' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা। বলাবাহুল্য, ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তির সাংবিধানিক গ্যারান্টি প্রদানের দাবী করা হয়েছিল। তখন সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে, আওয়ামী লীগ

সরকারের জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাই তাদের পক্ষে সাংবিধানিক গ্যারান্টি বা স্বীকৃতি প্রদান করা সম্ভব হবে না। তবে ভবিষ্যতে সংবিধান সংশোধনের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা তা প্রদান করবে বলে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। কিন্তু সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীকালে তার ধারেকাছেই যায়নি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকার।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে জাতি হিসেবে বাঙালি পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে এতে সংবিধানে ভিন্ন ভাষাভাষি ও ভিন্ন জাতিসত্তার অধিকারী আদিবাসী জাতিসমূহকেও 'বাঙালি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় যা জাতিগত নির্মূলীকরণের অংশ হিসেবে বলা যেতে পারে।

অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরুদ্ধে জনৈক বদিউজ্জামান ও এ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম কর্তৃক দায়েরকৃত দু'টি মামলায় ১২-১৩ এপ্রিল ২০১০ হাই কোর্ট থেকে রায় পরবর্তীতে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ আপীল আবেদনের চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারী করলেও উক্ত আপীল আবেদন দ্রুত নিস্পত্তির নিমিত্তে সরকারের মধ্যে চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে; যা চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে সরকারের অসদিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নয়।

সাম্প্রদায়িক হামলা ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী শক্তিকে মদদদান অব্যাহত

পূর্বের মতো এ সরকারের আমলেও ৭টি সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়েছে। যেমন-১৯-২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে বাঘাইহাট হামলা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে খাগড়াছড়ি হামলা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে লংগদু হামলা, ১৭ এপ্রিল ২০১ তারিখে রামগড়-মানিকছড়ি, ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে বাঘাইছড়ি-দীঘিনালা, ২২-২৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে রাঙ্গামাটি এবং সর্বশেষ ৩ আগস্ট ২০১৩ মাটিরাঙ্গা-তাইন্দং হামলা। মূলতঃ ঘরবাড়ী অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাটের মাধ্যমে জুম্মদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল করা এবং চূড়ান্তভাবে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে তাদের জায়গা-জমি জবরদখল করার উদ্দেশ্যেই আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় এসব হামলা সংঘটিত হয়েছে। এছাড়া পূর্বের মতো চুক্তি লঙ্ঘন করে অস্থানীয় ও বহিরাগতদের নিকট জুম্মদের জুম ভূমি ইজারা দেয়া, নানা অজুহাতে জুম্মদের তাদের চিরায়ত জায়গা-জমি থেকে উচ্ছেদ করার পাঁয়তারা, চুক্তি পরিপন্থী নানা কার্যকম হাতে নেয়া ইত্যাদি অব্যাহত হয়েছে। পক্ষান্তরে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ নামধারী সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের অবাধে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক ত্রাসের পরিস্থিতি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার মাধ্যমে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ষড়যন্ত্র চলছে।

চুক্তি বাস্তবায়নে অসহযোগিতার অপপ্রচার

কতিপয় সরকারের মন্ত্রী-আমলারা প্রায় অভিযোগ করেন জনসংহতি সমিতি বা সন্তু লারমা চুক্তি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে না। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জুম্ম জনগণসহ পার্বত্যবাসী পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে রাজনৈতিক ও শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের স্বার্থেই বরাবরই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি বা সন্তু লারমার আন্তরিকতার কোন ঘাটতি থাকতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর আজ প্রায় ১৬ বছর এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বর্তমান মহাজোট সরকারের আমলে পাঁচ বছর ধরে চরম ধৈর্য ধরে ঐকান্তিক সহযোগিতা দিয়ে চলেছে। তারই অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারের সকল বৈঠকে অংশগ্রহণ করে আসছে। এ সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির অনুষ্ঠিত ৫টি সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন এবং উদ্যোগ নিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। এ সরকারের আমলে পুনর্গঠিত প্রত্যাগত শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্সের অনুষ্ঠিত সকল সভায় (মোট চারটি সভা অনুষ্ঠিত) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছেন। ভূমি কমিশন আইন সংশোধনে আঞ্চলিক পরিষদ ও জনসংহতি সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ গভীর আশা ও আন্তরিকতা নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের সভায় নিয়মিত যোগদান করে আসছে। সাবেক চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশনের মাত্র একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতেও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান অংশগ্রহণ করেছেন (খাদেমুল ইসলাম দেড় ডজনের মতো সভা অনুষ্ঠানের যে দাবী করছেন তা মূলতঃ তিন জেলায় সফরকালে জেলার সরকারী কর্মকর্তা ও গণমান্য ব্যক্তিদের সাথে অনুষ্ঠিত সভা-যেগুলো তিনি ভূমি কমিশনের সভা হিসেবে গণ্য করেছেন। এসব সভা তিনি জেলা প্রশাসকদের মাধ্যমে ডেকেছেন যা ছিল বিধি-বর্হিভূত, কারণ জেলা প্রশাসকরা ভূমি কমিশনের সাথে সরাসরি যুক্ত নয়)। গত ১৬ জানুয়ারি ২০১২ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বৈঠকও করেন এবং তাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি দ্রুত ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় সুপারিশমালাও প্রধানমন্ত্রীর নিকট জমা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভির সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সন্তু লারমা একের পর এক বৈঠক করেছেন।

সুতরাং উল্লেখিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনসংহতি সমিতি বা সন্তু লারমা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহযোগিতা প্রদান করে চলেছেন। চুক্তি বাস্তবায়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বা সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা সহযোগিতা প্রদান করছেন না বলে সরকারের একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল থেকে যে অপপ্রচারণা চালানো হয় তা জনমতকে বিভ্রান্ত করার ষড়যন্ত্র বা নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার অপকৌশল বৈ কিছু নয়।

চুক্তি বাস্তবায়নে বা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যর্থতার পেছনে মূল কারণ

সরকার ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হলেও এবং ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের' অঙ্গীকার করলেও সরকারের চুক্তি বাস্তবায়নের কোন সদিচ্ছা ছিল না। তাই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি-বাঙালি স্থায়ী অধিবাসীগণ ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসলেও ও সরকারকে সহযোগিতা দিয়ে গেলেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার বিগত ৫ বছরে চুক্তি বাস্তবায়নে সক্রিয় এবং আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। এর পেছনে অন্যান্যের মধ্যে মূল কারণগুলো ছিল-

১. চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। এজন্য জনসংহতি সমিতিসহ দেশের নাগরিক সমাজের দাবী সত্ত্বেও চুক্তি বাস্তবায়নে সরকার সময়সূচিভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণায় সরকার এগিয়ে আসেনি।

২. সরকারের মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িক ও উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তি প্রভাবশালী, যারা চুক্তি বাস্তবায়ন চায় না।

৩. পার্বত্য চট্টগ্রামে অব্যাহত সেনা কর্তৃত্ব, যা চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে নানাভাবে বাধাগ্রস্ত করে আসছে।

৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি নেতিবাচক।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাস।

আমি বাংলাদেশী, কিন্তু বাঙালি নই

ত্রিজিনাদ চাঙমা

কেউ বলেনি, আমি বাঙালি
আমি বাঙালি হতে পারি না;
আমি চাকমা,
আমার বাপ-দাদা-চৌদ্দ পুরুষ সবাই চাকমা
তাই আমি বাঙালি নই।

বাংলাদেশ আমার প্রিয় মাতৃভূমি
কোটি জনগণের সঙ্গে আমরা পাহাড়ীরাও আছি
বৈচিত্র্যতাই এদেশের সংস্কৃতি
ভালোবাসি আমার এ জন্মভূমি।

এমন বাংলাদেশ চেয়েছিলাম যেখানে-
অভাব থাকবে না, হাহাকার থাকবে না
মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ থাকবে না,
হিংসা-বিদ্বেষ কিছুই থাকবে না
যেখানে শুধু থাকবে-
প্রেম-প্রীতি-মমতা আর মানবতা।

এদেশের মাটি ও মানুষকে ভালোবাসি বলে
এখানে আমার অস্তিত্ব থাকবে বলে-
স্বশাসন প্রতিষ্ঠা এবং জুম্ম জনগণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রক্ষার কথা বলেছিলাম।
তাই সংবিধানের "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাঙালি বলিয়া পরিচিত হইবেন"
আমি মানিনি
মানতে পারিনি।

একজন বাঙালি কোনদিন চাকমা বা মারমা হতে পারে না
আমিও বাঙালি হতে পারি না,
কেউ বলেনি, আমি বাঙালি
আমি বাঙালি হতে পারি না;
আমি চাকমা,
আমার বাপ-দাদা-চৌদ্দ পুরুষ সবাই চাকমা
তাই আমি বাঙালি নই।

তবে আমি বাংলাদেশি, কিন্তু বাঙালি নই।

রুখে দাঁড়াও কাচালং

শরৎ জ্যোতি চাকমা

কাচালং নদীর উজানে ঝাঁকো তরুণ বিষণ্ন মনে পথ চলে
হাতে প্রতিবাদের নিশান, কারোর মাথায় লাল ফিতা
শ্লোগানের প্রতিধ্বনি- লে. ফেরদৌস, কল্পনাকে ফিরিয়ে দাও
অতঃপর, রাইফেল মেশিনগানের বিকট আওয়াজ, বাতাসে বারুদের গন্ধ
কাচালং নদীর স্বচ্ছ জলে মিশে যায় লাল রঙ-
শব্দহীন হয়ে পড়ে সুকেশ মনতোষ আর সমর বিজয়।
আমি কাচালং নদীর উজানে কল্পনার আর্তচিৎকার শুনি
শোষকের প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে
রাইফেল মেশিনগানের বুলেটে ঝাঁঝরা বুকেও মুক্তির জয়গান গায়
বিপন্ন জীবনের অধিকার খোঁজে।
আমি কাচালং নদীর তীরে-
সুকেশ মনতোষ সমর বিজয়ের বিপ্লবী শ্লোগানের প্রতিধ্বনি শুনি
অথচ তাদের রক্তের ঋণ শোধ করতে পারেনি এ জাতি
হতভম্ব নিযুত জন, দেখে যায় স্বরক্তের বেঈমানী।
বুদ্ধপুদিদের রক্তের রাঙা বাঘাইহাট বিপ্লবীর সন্ধান করে
শকুন আর বেঈমানদের দানবতায় ছাড়খার সাজেক
এখনো বেঁচে থাকার আকুতি,
কল্পনার কাচালং লড়াই থামিও না, রুখে দাঁড়াও ॥

মাইনি নদীর তীরে কিশোরী সুজাতার নিথর দেহ।
মায়ের চোখে লোনাজল, নির্বাক বাবা,
বেদনায় বুক দাউ দাউ করে
শোকার্ত মনিশংকর খোকনেরা জ্বলে উঠে
মাইনির আর কত শব পাঠাবে হাসপাতালে?
নিলয় টিপুদের রক্তের জমাট বেধেঁছে
কল্পনা সুজাতাদের রক্তের জমাট বেঁধেছে
সুবীর ওস্তাদ এর রক্তের জমাট বেঁধেছে,
১৯৮৯ সালের ৪ঠা মে মাইনী মুখে ঝরে যাওয়া অসংখ্য প্রাণ
কল্পনার কাচালং লড়াই থামিও না
রুখে দাঁড়াও।

‘ধীরে চলো নীতি’ গ্রহণ করতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের কাজ সরকার অবশেষে ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছে

নবম জাতীয় সংসদের মেয়াদ একদম শেষ পর্যায়ে এসে গেলেও ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর সংশোধনার্থে আনীত বিলের উপর মতামত প্রদানে রহস্যজনকভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া বিষয়ে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ২৭ মে ২০১৩ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩’ বিল মন্ত্রীসভায় উত্থাপিত হয়েছে এবং তারই আলোকে গত ৩ জুন ২০১৩ অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে উক্ত বিল অনুমোদিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৬ জুন ২০১৩ উক্ত সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে এবং বিধি মোতাবেক মতামত চেয়ে উক্ত বিল ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত বিলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্তকৃত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও ৩০ জুলাই ২০১২ তারিখে আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ১০টি সংশোধনী প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাকী ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সংধোশনী প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে বাদ দেয়া হয়েছে এবং অপরদিকে উত্থাপিত ১০টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ২টি সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন যথাযথভাবে সংশোধনকল্পে উক্ত বিলের উপর পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে ১৮ জুন ২০১৩ সরকারের নিকট পাঁচ দফা সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করা হয়।

উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গত ১৬ জুলাই ২০১৩ জাতীয় সংসদের কেবিনেট সভাকক্ষে ভূমি কমিশন বিলের উপর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত করে, এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে সংশোধনী দাবীনামাসমূহ পুনরায় উত্থাপন করা হয়। এরপর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত করে, যেখানে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ভূমি কমিশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিরোধিতাকারী পার্বত্য যুব ফ্রন্ট, পার্বত্য নাগরিক পরিষদ, বাঙালি ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকেও আমন্ত্রণ করা হয়। সর্বশেষ গত ৩ অক্টোবর ২০১৩ সংসদীয় স্থায়ী কমিটি আবার বৈঠকে বসে। উক্ত সভার আলোচ্যসূচিতে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩’ বিলটি ১ নম্বর আলোচ্য বিষয় হলেও সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা না করে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইনটি সংশোধনে সরকার কালক্ষেপণ ও ধীরে চলো নীতি গ্রহণ করেছে এবং এরই অংশ হিসেবে সংসদীয় কমিটিতে এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে ঝুলিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে।

সরকারের তরফ থেকে এ ধরনের নীতি গ্রহণ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারেরই বরখেলাপ এবং চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের চরম অসদিচ্ছারই প্রতিফলন বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি মনে করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বস্তুতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং জাতীয় সংসদ থেকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের পর মুখ্যতঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সাথে সাজুস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এ সংক্রান্ত বিলের উপর শুনানী অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, যারা ভূমি কমিশনসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিরোধিতা করে আসছে এবং গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে নানা বিভ্রান্ত ছড়িয়ে আসছে সেই সেটেলারদের নেতৃত্বাধীন পার্বত্য সমঅধিকার আন্দোলন, পার্বত্য যুব ফ্রন্ট, পার্বত্য নাগরিক পরিষদ, বাঙালি ছাত্র পরিষদ ইত্যাদি ভূঁইফোড় সাম্প্রদায়িক সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় আমন্ত্রণ জানানো নিঃসন্দেহে চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সদিচ্ছা-প্রসূত নয় বলে বলা যেতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ এর সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্তকরণে এ সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদের মধ্যে সাড়ে চার বছরাধিক সময় ক্ষেপণ করা হয়। এরপর সরকারের একেবারে শেষ মেয়াদে এসে গত ১৬ জুন ২০১৩ ত্রুটিপূর্ণভাবে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩’ বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হয়। তারপর এই ত্রুটিপূর্ণ বিল সংশোধন করতে বিগত চার মাসে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি তিনটি সভা আহ্বান করলেও পরিশেষে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে আইনটি সংশোধনের কাজ রহস্যজনকভাবে ঝুলিয়ে রেখে দেয়। বলাবাহুল্য যে, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও দীর্ঘ সাড়ে চার বছরের ঐকান্তিক ধৈর্য ও নিরলস প্রয়াসের মধ্য দিয়ে সরকারের শেষ মেয়াদে আইনটি সংশোধনের যে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে, তাও ‘ঝুলিয়ে রাখার নীতি’ গ্রহণের ফলে তা অনেকটা ‘ঘাটে এসে নৌকা ডুবার’ মতো অর্জিত ফলাফলকে নস্যাৎ করতে বসেছে সরকার।

নির্বাচনী অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও এ সরকারের মেয়াদকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় জনমনে যে ক্ষোভ ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছে, সরকারের শেষ মেয়াদে এসে ভূমি কমিশন আইন যথাযথভাবে সংশোধনের মাধ্যমে সেই ক্ষোভ ও অসন্তোষ কিছুটা হলেও লাঘবের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল ভূমি কমিশন আইন সংশোধনে সরকারের পিছিয়ে যাওয়ার ফলে সেই সম্ভাবনাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে বাধ্য; উপরন্তু এ সরকারের প্রতি পার্বত্যবাসীর সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষ আরো জোরদার হবে। শুধু তাই নয়, সরকারের এই পশ্চাদাপসারণের ফলে সারাদেশের আদিবাসী জাতিসমূহের প্রতি সরকারের নেতিবাচক ইঙ্গিতও বহন করে, যা নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগের জন্য কখনোই মঙ্গলজনক হতে পারে না। ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের কাজ ঝুলিয়ে রাখার ফলে একদিকে যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিবিরোধ নিস্পত্তির কাজ আরো প্রলম্বিত হবে, অন্যদিকে তেমনি এই ভূমিবিরোধ আরো জটিল আকার ধারণ করবে। এতে করে ভূমিকে কেন্দ্র করে চলমান সংঘাত ও সমস্যা অধিকতর ঘনীভূত হবে এবং সরকার তথা দেশের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি পাহাড়ি-বাঙালি নির্বিশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের অনাস্থা ও অবিশ্বাস আরো বৃদ্ধি পাবে।

এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিবিরোধ যথাযথ ও অনতিবিলম্বে সমাধানের স্বার্থে চলতি সংসদ অধিবেশনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল পাশ করার দাবি জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। অন্যথায় যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য বর্তমান সরকারই দায়ী থাকবে বলে সমিতি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে।

অপহৃত ৫২ জনের মধ্যে তিন দফায় ৪৮ জনকে ছেড়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, লুকোচুরির পর অবশিষ্ট ৪ জনের মুক্তি

৪৬ পৃষ্ঠার পর

হত্যা করে লাশ গুম; রাঙ্গামাটি'র লংগদু উপজেলা সদরের টিনটিল্যা গ্রামের কাত্তলতলায় গত ১৫ জুন ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য করুণ চাকমাকে (৪৩) গুলি করে হত্যা; রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার মারিশ্যা বারবিন্দুঘাট এলাকা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত মুঠোফোন কোম্পানি টেলিটকের সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান বি-টেকনোলজির পাঁচজন কর্মকর্তাকে গত ৮ জুলাই ২০১৩ অপহরণ ও মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া এবং উদ্ধার অভিযান নিয়ে প্রশাসনের নাটক ইত্যাদি। প্রশাসনের নাকের ডগায় এসব সন্ত্রাসী ঘটনা প্রতিনিয়ত পার্বত্য চট্টগ্রামে ঘটে চলেছে। সঙ্গতঃ কারণেই জনমনে আজ প্রশ্ন-জননিরাপত্তার নামে এত নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ঢাকা পার্বত্য চট্টগ্রামের বুকে প্রসিত বিকাশ খীসার ইউপিডিএফ নামক সন্ত্রাসী বাহিনী কিভাবে ১৬ বছর ধরে সন্ত্রাসীর রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে? সেই তিন বিদেশী প্রকৌশলীকে অপহরণ ও দশ কোটি টাকা মুক্তিপণ আদায় হতে শুরু বহু আলোচিত সন্ত্রাসী কার্মকান্ডের পরও সরকার কেন ইউপিডিএফের ব্যাপারে বরাবরই নির্লিপ্ততা প্রকাশ করে আসছে?

তাইন্দং-এ ফিরে আসে যশোর রোড ১৯৭১

৩৩ পৃষ্ঠার পর

নিরাপত্তার অভাবে বিদ্যাপীঠে যেতে পারবে না, সেটা রাষ্ট্রের জন্য সুখকর কোন সংবাদ নয়। শুধু তাইন্দং-এর মানুষরা নয়, পাহাড়ের সর্বত্রই এখন জুম্ম জনগণ সংখ্যায় কমে যাচ্ছে। ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন সংস্কৃতির এই মানুষদের জন্য পাহাড় হয়ে উঠুক নিরাপদ আবাসস্থল। এটাই হবে রাষ্ট্রের জন্য গৌরবের। ১৯৭১ যশোর রোডের জীবনের দুর্বিষহ স্মৃতি যেন জুম্ম জনগণের জীবন না হয়। জীবন যেন তাদের হয়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র জুম্ম জনগণকে তাদের জীবন ফিরিয়ে দেবে। এইটুকু প্রত্যাশা করা কি অন্যায় হবে? পাহাড়ের জাতিগত বৈচিত্র্য ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বহুমাত্রিকতার উপাদানকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বহুমাত্রিকতা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য এক গৌরবের। সেই সাথে সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের পরিচয়ও বহন করে। সাংস্কৃতিক, ভাষাগত ও জাতিগত বৈচিত্র্য এবং বহুমাত্রিকতা ধারণ করে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়ে উঠুক। একটি অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য আদিবাসী জাতিসমূহের নিরাপত্তা এবং তাদের জাতিগত স্বীকৃতির বিষয়টি অন্যতম প্রধান পরিমাপক। তাইন্দং-এর মত হামলা যত সংঘটিত হবে ততই রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি সংকটের মুখে পড়বে। এই বিষয়টি রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারকরা কবে বুঝতে সক্ষম হবেন?

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৬২ জন অপহরণ

অপহৃত ৫২ জনের মধ্যে তিন দফায় ৪৮ জনকে ছেড়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা, লুকোচুরির পর অবশিষ্ট ৪ জনের মুক্তি

অবশেষে নানা নাটকীয়তা ও হয়রানির পর ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অপহৃত ৫২ জনের মধ্যে তিন দফায় ৪৮ জনকে মোটা অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিয়েছে। প্রথম দফায় ৩ জন, দ্বিতীয় দফায় ৩৪ জন এবং তৃতীয় দফায় ১১ জনকে ছেড়ে দিয়েছে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা।

উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে অংশগ্রহণের পর তার পরদিন ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ ট্রলারযোগে বাড়ী ফেরার পথে রাঙ্গামাটি'র বরকল উপজেলার সুবলং ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী লংগদু উপজেলার কাট্টলী বিল হ্রদের জোড়াটিলা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে ৭ নারী ও শিশুসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ও সমিতির অঙ্গ সংগঠনের ৬২ জন নেতা-কর্মী ও সমর্থককে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তপন জ্যোতি চাকমা ওরফে বর্মা ও প্রবীর চাকমা ওরফে বিশালের নেতৃত্বে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা এ অপহরণ ঘটানো হয় বলে জানা যায়। অপহরণের অব্যবহিত পরে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ ৯ জনকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ অপহরণকারীদের কাছ থেকে একজন পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। অপহৃত অন্য ৫২ জনকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অজ্ঞাত স্থানে বন্দি করে রাখে। এদিকে অপহরণকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের মুক্তির বিষয়ে নানা উদ্ভট শর্তারোপ করতে থাকে। বলাবাহুল্য অন্যদিকে অপহৃতদের উদ্ধারে প্রশাসনও নীরব ভূমিকা পালন করে থাকে।

আরো উল্লেখ্য যে, বাঘাইছড়ি ইউনিয়নের লাম্বাছড়া গ্রামের বাসিন্দা অপহৃত মৃগসোনা চাকমার স্ত্রী রীনা চাকমা গত ১৪ মার্চ ২০১৩ অসুখে মারা যান। তার পিতা মঙ্গলচান চাকমাও গত ৭ এপ্রিল ২০১৩ পুত্র শোকে মারা যান। মধ্যস্থতাকারী জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের অনেক অনুরোধের পরও অপহৃত মৃগসোনা চাকমাকে ছেড়ে দেয়নি সন্ত্রাসীরা। অপহৃতদের মধ্যে ৯ জন ছাত্রকে ছেড়ে দেয়ার জন্য বারবার অনুরোধ করা হলেও অপহরণকারী ইউপিডিএফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। অপহরণের তিনমাস পর মুক্তিপণের বিনিময়ে অসুস্থতার কারণে তিনজনকে ছেড়ে দেয়। তারা হলেন–

১. বিজয় সম্রাট চাকমা, পিতা-তিলক বৈদ্য, ঘনমোর, লংগদু;

২. ম্যানশন চাকমা ওরফে মিলন (৩২), পিতা-সুশান্ত চাকমা, শান্তিনগর, গুলশাখালী, লংগদু;

৩. লক্ষ্মী মনি চাকমা (৪৬) পিতা-মৃত পহর চান চাকমা, উত্তর শিজক, বাঘাইছড়ি (প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য)।

অপহরণের পাঁচ মাস তের দিন পর গত ২৯ জুলাই ২০১৩ লংগদু উপজেলার ১৯ জন এবং বাঘাইছড়ি উপজেলার ১৫ জন মোট ৩৪ জনকে ইউপিডিএফ শর্তসাপেক্ষে ছেড়ে দেয়। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে মোট ১৮ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ আদায় করা হয়। মুক্তির আগে ২৬ ও ২৮ জুলাই ২০১৩ খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়াস্থ বাঘাইছড়িমুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুক্তিপণের টাকাগুলো ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা এবং তার সহযোগী অনি চাকমাকে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, অপহরণের পর সুজনের পিতা জীতেন্দ্র চাকমা ইউপিডিএফকে গালিগালাস করার কারণে সুজন চাকমাকে অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়। মুক্তি পাওয়ার খবর কোন মিডিয়াতে প্রচার করা বা যোগাযোগ করা যাবে না ও মুক্তির পর তারা জেএসএস, ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী কোন পক্ষে কাজ করতে পারবে না মর্মে ইউপিডিএফ কর্তৃক শর্তারোপ করা হয়। মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন-

লংগদু উপজেলা-

১. ভূমিত্র চাকমা (১৮) পিতা-সুমতি রঞ্জন চাকমা, গ্রাম-ইয়েরেংছড়ি (ছাত্র রাবেতা কলেজ);

২. অমর কান্তি চাকমা পিতা-বহন্দ চাকমা, গ্রাম-ঘনমোর (ছাত্র, রাবেতা কলেজ);

৩. অন্তর চাকমা (১৮) পিতা-স্মৃতি বিকাশ চাকমা, গ্রাম-দাদীপাড়া;

৪. সুইন চাকমা (১৯) পিতা-জ্ঞানজ্যোতি চাকমা, গ্রাম-চাল্যাতলী;

৫. এটম চাকমা (১৯) পিতা-সূর্য কুমার চাকমা, গ্রাম-বগাচতর, চিবেরেগা;

৬. বিজয় চাকমা (১৭) পিতা-চিকন চান চাকমা, গ্রাম-সোনাই;

৭. দয়াল কান্তি চাকমা (২০) পিতা-অমলেন্দু চাকমা, গ্রাম- চাল্যাতলী;

৮. মিলন চাকমা (৩০) পিতা-রঞ্জিত কার্বারী, রাঙ্গীপাড়া;

৯. সুখময় চাকমা (৩৮) পিতা-বিজাব চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-গুলশাখালী;

১০. লাল বাহাদুর চাকমা ওরফে রত্ন কুমার চাকমা (৪৫) পিতা-মৃত ব্রজেন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঘনমোর;

১১. লক্ষ্মী কাবরি (৫৫) পিতা-মৃত ভারত চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঘনমোর;

১২. বিজয় গিরি চাকমা (৪০) পিতা-ব্রজেন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঘনমোর;

১৩. স্নেহ কুমার চাকমা, (৪৫) পিতা-চন্দ্র কান্তি চাকমা, গ্রাম-ঘনমোর;

১৪. অনিল বিহারী চাকমা, পিতা-মৃগ কান্তি চাকমা, গ্রাম-ঘনমোর;

১৫. রিপন জ্যোতি চাকমা, পিতা-মৃত নরেন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঘনমোর;

১৬. রিকন চাকমা (১৯) পিতা-রসিক মোহন চাকমা, গ্রাম- বগাচতর (চিবারেগা) (ছাত্র,রাবেতা কলেজ);

১৭. সোহেল চাকমা (২২) পিতা-কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-মহাজন পাড়া;
১৮. শুভশান্তি চাকমা, পিতা-বরুন কুমার চাকমা, গ্রাম-শান্তিনগর;
১৯. সুজন চাকমা (১৯) পিতা-জীতেন্দ্র চাকমা, গ্রাম-শিলপাদ'ছড়া

বাঘাইছড়ি উপজেলা-

২০. মৃগসোনা চাকমা পিতা-মঙ্গল চান চকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২১. রাধিকা মনি চাকমা (৪৫) পিতা-লক্ষী ধন চাকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২২. শুক্রমনি চাকমা (৩৩) পিতা-বানেশ্বর চাকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২৩. উগ্রমনি চাকমা (৩২) পিতা-বানেশ্বর চাকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২৪. সুরেশ কুমার চাকমা, পিতা-মৃত মঙ্গল ধন চাকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২৫. শান্তি কুমার চাকমা (৩৩) পিতা-মৃত পত্যাচরণ চাকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২৬. লক্ষী শংকর চাকমা (৩৬) পিতা-কামিনী কুমার চাকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২৭. মধু জীবন চাকমা (২১) পিতা-রিজেব কুমার চাকমা, গ্রাম-উত্তর খাগড়াছড়ি;
২৮. অরুন চন্দ্র চাকমা (৫৮) পিতা- মৃত ভাগ্য চরণ চাকমা, গ্রাম-উত্তর শিজক;
২৯. দয়াল বিন্দু কার্বারী (৪৭) পিতা- সতীশ চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-উত্তর সারবুয়াতলী;
৩০. নয়ন বিকাশ চাকমা (৩৫) পিতা-লক্ষী কুমার চাকমা, গ্রাম-উত্তর সারবুয়াতলী;
৩১. বরুণ খীসা (৩৫) পিতা-কিরণ কুমার খীসা, গ্রাম-তালুকদার পাড়া (প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য);
৩২. কৃষ্ণমনি চাকমা (৪০) পিতা-মৃত দীন মোহন চাকমা, গ্রাম-চুরাখালী (প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য);
৩৩. অসীম চাকমা, পিতা-ওরফে কাল্যা চাকমা, গ্রাম-চুরাখালী;
৩৪. ইন্দ্রজয় চাকমা, পিতা-প্রভাত চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-চুরাখালী।

এদিকে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অপহরণকারীরা লংগদু উপজেলার ৪ জন ও বাঘাইছড়ি উপজেলার ৭ জন মোট ১১ জনকে মুক্তি দেয়। তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে মাথাপিছু ১,৫০,০০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা করে মুক্তিপণ আদায় করে বলে জানা যায়। মুক্তিপণের টাকাগুলো ইউপিডিএফ নেতা প্রদীপন খীসা ও আদি চাকমার হাতে দেয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন-

১. যশো চাকমা (২৫) পিতা-ভূপতি রঞ্জন চাকমা, গ্রাম-রাঙ্গীপাড়া, লংগদু;
২. বিনয় সাধন চাকমা (২৩) পিতা-কিনারাম চাকমা, গ্রাম-শিলপাদাছড়া, লংগদু;
৩. অমর চাকমা (১৯) পিতা-রমনী চাকমা, গ্রাম- রাঙ্গাপানিছড়া, লংগদু;
৪. বিনয় কান্তি চাকমা বিটু (৩০) পিতা-মতিলাল চাকমা, গ্রাম-দক্ষিণ সারবুয়াতলী, বাঘাইছড়ি;
৫. বীরবাহু চাকমা, (৩৩) পিতা-ফুলেশ্বর চাকমা, গ্রাম-বড় মাইল্যা, বাঘাইছড়ি;
৬. নীল চন্দ্র চাকমা, (৩৫) পিতা-মৃত রঞ্জন্যা চাকমা, গ্রাম-পেরাছড়া, লংগদু;
৭. বৃদ্ধাংকুর চাকমা, (৩৭) পিতা-সাধন কুমার চাকমা, গ্রাম-তালুকদার পাড়া, বাঘাইছড়ি;
৮. ললিত রঞ্জন চাকমা, (৪৬) পিতা-মৃত রবীন্দ্র কুমার চাকমা, গ্রাম-মোষপয্যা, বাঘাইছড়ি;
৯. চন্দ্র শেখর তালুকদার, (৩৫) পিতা-মৃত অশ্বিনী কুমার তালুকদার, গ্রাম-উত্তর শিজক, বাঘাইছড়ি;
১০. চিরঞ্জীব চাকমা, দীঘিনালা এলাকাবাসী;
১১. পরিমল চাকমা তাপস (৪৩), পিতা-মৃত চন্দ্রধর চাকমা, গ্রাম-কুসুমছড়ি, বরকল (বরকল ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ড মেম্বার)।

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৩ বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সময় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা বাকী চারজন জেএসএস সদস্যকে ছেড়ে দেয়। তাঁরা কোন এক বৌদ্ধ বিহারে শ্রমণ হন। তারা হলেন-

১. মণি শঙ্কর চাকমা (৩৫) পিতা বীরেন্দ্র লাল চাকমা, বড়াদম, লংগদু;
২. খোকন চাকমা (৩৮) পিতা উপল কান্তি চাকমা, কদমতলী, বাঘাইছড়ি;
৩. পলক তালুকদার (৪৮) পিতা ললিত বরণ তালুকদার, বাবুপাড়া, বাঘাইছড়ি;
৪. ভূমিত্র চাকমা (৪০) পিতা যামিনী কুমার চাকমা, তুলাবান, বাঘাইছড়ি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা একের পর এক অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হত্যা, গুম, বেপরোয়া চাঁদাবাজি, নির্বাচন বাণিজ্য, গ্রেনেড হামলা ইত্যাদি ত্রাসের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণের কাছে ইউপিডিএফ আজ এক আতঙ্কের নাম। প্রতিনিয়ত ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হয়ে মুক্তিপণের টাকা গুনতে গিয়ে অনেকেই আজ সহায় সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ ঘোষণা দাবি করা হলেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি বরং সরকারের একটি স্বার্থান্বেষী মহল বরাবরই চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফকে মদদ দিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহরণ বাণিজ্যের সাথে খোদ প্রশাসনের দায়িত্বশীল অনেক কর্মকর্তাসহ সরকারের দলীয় নেতাদের সংশ্লিষ্টতার বিষয়টিও সবার কাছে এখন ওপেন সিক্রেট।

তারই সাম্প্রতিক উদাহরণ হলো-গত ১৭ জুন ২০১২ সুবলং ইউনিয়নের চিলাকধাক এলাকা থেকে ১২ জন নিরীহ জুম্ম কৃষককে অপহরণ; গত ২৫ জুলাই ২০১২ বন্দুকভাঙ্গা এলাকা থেকে ৯ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ; গত ৮ আগস্ট ২০১২ অস্ত্রের মুখে রাঙ্গামাটির রাজদ্বীপ এলাকা থেকে ২৪ জন নিরীহ ব্যক্তিকে অপহরণ; গত ১৬ আগস্ট ২০১২ সুবলং ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড মেম্বার চন্দ্র কুমার চাকমাকে জিম্মি এবং অমানুষিক নির্যাতন; গত ৩ ডিসেম্বর ২০১২ রাঙ্গামাটির সমতাঘাট থেকে স'মিলের একজন ম্যানেজারসহ ৩ জন বাঙালি শ্রমিককে অপহরণ; গত ১৬ জানুয়ারী ২০১৩ সুবলং ইউনিয়নের দিঘলছড়ি গ্রাম থেকে কমপক্ষে ১২ জন জুম্ম নারী অপহরণ; গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ রাঙ্গামাটির কুতুকছড়ি এলাকা থেকে গ্রামীণফোনের কর্মচারীকে অপহরণ; গত ১৭ এপ্রিল সেনাবাহিনীর জলযান ঘাটের নাকের ডগায় রাঙ্গামাটিস্থ রাজবাড়ী স' মিল থেকে অস্ত্রের মুখে ২ জন বাঙালি শ্রমিককে অপহরণ; গত ৫ জুলাই ২০১৩ খাগড়াছড়ি'র মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী ইউনিয়নের ভোলাছড়া (মংচিনু হেডম্যান পাড়া) গ্রামে উমং মারমাকে (৫৫) গুলি করে হত্যা; গত ২৯ জুলাই ২০১৩ রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের ১৮ মাইল নামক এলাকায় ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বেক্সিমকো ও রেনেটা ঔষধ কোম্পানীর দু'টি গাড়ি আটকে চালককে মারপিট ও তিন লাখ টাকার ঔষধ লুট; গত ২৯ আগষ্ট ২০১৩ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক শুভলং ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য বিমলেন্দু চাকমাকে (৪৫) অস্ত্রের মুখে অপহরণের পর

#৪৪পৃষ্ঠায় দেখুন

সেটেলার বাঙালিদের হামলা ও ভূমি জবরদখল

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সেটেলার বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, জোরপূর্বক ও নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখল, নানা অজুহাতে জুম্মদের হত্যা, অপহরণসহ সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে এর কিছু ঘটনার বিবরণ দেয়া গেল-

পানছড়িতে সেটেলার বাঙালিদের হামলায় এক জুম্ম গুরুতর আহত

গত ১ মে ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ি ইউনিয়নের মানিক্যাপাড়ার বড়কলক গ্রামের কালাসোনা চাকমাকে (৫৫) পীং-চন্দ্র বিকাশ চাকমা নামের এক নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক হামলার শিকার হন। পরে প্রতিবেশীরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় পানছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করিয়ে দেয়।

জানা যায়, ঘটনার সময় উল্টাছড়ি ইউনিয়নের জিয়ানগর (সেটেলার বাঙালিদের দেয়া নাম) সেটেলার বাঙালি পাড়া থেকে ৭ জন বাঙালি স্থানীয় মানিক্যাপাড়া গ্রামে মদ পান করতে যায়। এ সময়ে একদল ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী গ্রামে এসে বাঙালিদের ধরার চেষ্টা করে। তবে সেটেলার বাঙালিরা সরে আসতে সমর্থ হয়। কিন্তু সে সময় মরাটিলা বাগানবাড়ি থেকে ফেরার পথে কালাসোনা চাকমাকে সামনে পেয়ে সেটেলার বাঙালিরা হামলা চালিয়ে মারাত্মক আহত করে। কালাসোনা চাকমাকে হামলার সাথে জড়িত ৭ জন সেটেলার বাঙালিদের মধ্যে চিহ্নিত চারজন হল-(১) হারুন (২২) পীং-জয়নাল আবেদীন, (২) সোহাগ (২০) পীং-অজ্ঞাত, (৩) দীন ইসলাম (২৩) পিতা-মোঃ মোরশেদ ও (৪) খোকন (২২) পিতা-মোঃ আবদুল।

বান্দরবানের রাজভিলায় রোহিঙ্গা জঙ্গী তৎপরতা

২০১৩ সালের জুন মাসে বান্দরবান সদর উপজেলার রাজভিলায় প্রায় ১০-১৫ জনের রোহিঙ্গা সশস্ত্র জঙ্গীদের তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। জানা যায়, এ সময় তারা বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন রাজভিলা ইউনিয়নের রাজভিলা এলাকায় সুইসাউ মারমা (মাস্টার) এবং তৈনখালি বাজারের অংসিং নু মারমা ও চিং মং ডাক্তারের মালিকানাধীন ৩টি দোকানে ডাকাতি করে। তারা এমনকি এই এলাকায় এক জুম্ম নারীকেও ধর্ষণ করে, কিন্তু সামাজিক সংকোচের কারণে তা প্রকাশ করা হয়নি। জানা যায়, রাঙ্গামাটি জেলাধীন রাজস্থলী উপজেলার বাঙ্গালহালিয়া, ২ নম্বর এলাকা ও ধল্যা মুসলিম পাড়ায় প্রায় ১৬-১৭ রোহিঙ্গা পরিবার বেশ কিছু দিন বসবাস করে আসছে। সাধারণত এই রোহিঙ্গা বাড়িতে রোহিঙ্গা জঙ্গীরা আশ্রয় নিয়ে থাকে।

মাটিরাঙ্গা-তাইন্দং এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১১ জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা ৩৬ বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, বৌদ্ধ মন্দিরসহ ৪শ' বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাঙচুর, ২ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত

গত ৩ আগস্ট ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৩:০০ ঘটিকা থেকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ১১টি গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট চালানো হয়। হামলায় সর্বেশ্বর পাড়ায় বৌদ্ধ বিহারের ১টি ঘরসহ ১৯টি বাড়ী, বগা পাড়ায় ১২টি, তালুকদার পাড়ায় ২টি ও বান্দরসিং পাড়ায় (ভগবান টিলা) ৩টি বাড়ি মোট ৩৬টি ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং সর্বেশ্বর পাড়া জনশক্তি বৌদ্ধ বিহার ও মনুদাস পাড়া বৌদ্ধ বিহার নামে ২টি বৌদ্ধ মন্দিরসহ প্রায় ৪০০ ঘরবাড়ীতে লুঠপাট ও ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া হামলায় শিশুসহ অন্তত ১২ জন জুম্ম আহত হয়।

এ হামলায় ১৩ গ্রামের ৯০২ পরিবারের প্রায় ৪,৫০০ গ্রামবাসী শিকার হয়। তন্মধ্যে প্রাণের তাগিদে ৪৫৪ পরিবারের প্রায় ২০০০ জুম্ম গ্রামবাসী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পার হয়ে ভারতীয় ভূখন্ডের 'নো ম্যান'স ল্যান্ডে' আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া ৩৮০ পরিবারের প্রায় ১,৫০০ ত্রিপুরা গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী পানছড়ি উপজেলায় এবং ৩৫ পরিবার জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া হামলায় অনেক ছাত্রছাত্রীর বইপত্র ও পোশাক-পরিচ্ছদ পুড়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হামলায় কমপক্ষে ১২ জন জুম্ম আহত হয়েছে বলে জানা যায় যাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিজিবি সদস্যদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে মারধর ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। ঐদিন দিন-দুপুরে সেটেলার বাঙালিদের সংঘবদ্ধ হামলা চলাকালে স্থানীয় বিজিবি ও পুলিশ কোন যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

জানা যায়, সেদিন ৩ আগস্ট দুপুরের দিকে জনৈক মটর সাইকেল চালক মোঃ কামাল হোসেন নামে সেটেলার বাঙালিকে তাইন্দং এলাকার বান্দরসিং পাড়া থেকে ইউপিডিএফ কর্তৃক অপহরণ করা হয় বলে সেটেলার বাঙালিরা প্রচার করে।

এ ঘটনা প্রচারের সাথে সাথে সেটেলার বাঙালিরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাইন্দং এলাকার বিভিন্ন স্থানে জড়ো হতে থাকে এবং জুম্মদের বিরুদ্ধে উগ্র সাম্প্রদায়িক শ্লোগান দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে জুম্ম গ্রামে হামলা শুরু করে এবং ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।

বিকেল ৩.০০ ঘটিকা থেকে প্রায় ৪-৫ ঘন্টা ধরে বিজিবি ক্যাম্পের নিকটবর্তী এলাকায় সেটেলার বাঙালিরা হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুঠপাট ও ভাঙচুর চালায়। কিন্তু সেটেলার বাঙালিরা জুম্ম গ্রামগুলোর দিকে হামলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছে জেনেও বিজিবি সদস্যরা সেটেলারদের রোধ করতে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। ঘটনার শিকার ১৩টি গ্রামের পরিবারের সংখ্যা দেয়া গেল-

ক্র.নং	গ্রাম	পরিবার	ইউনিয়ন
১	ভগবানটিলা	৫২	তাইন্দং
২	বান্দসিংপাড়া	২৮	ঐ
৩	বগাপাড়া	১৩৮	ঐ
৪	সর্বেশ্বর পাড়া	৭০	ঐ
৫	মনুদাস পাড়া	৫৯	ঐ
৬	আচালং মারমা পাড়া	৭০	ঐ
৭	কৃষ্ণদয়াল পাড়া	০৭	ঐ
৮	তংগ মহাজন পাড়	৪৩	ঐ
৯	বাত্তিটিলা	২৩	ঐ
১০	হেডম্যান পাড়া	১৪৩	ঐ
১১	পূর্ব বাড়ি পাড়া	৫৯	ঐ
১২	তালুকদার পাড়া	৪৬	তবুলছড়ি
১৩	লাইফু কার্বারী পাড়া	১৬৮	ঐ
	মোট	৯০২	

ঘটনার বিষয়ে বগাপাড়ার অধিবাসী অনিল বিকাশ চাকমা কর্তৃক মাটিরাঙ্গা থানায় ৩০ জনের নামসহ অজ্ঞাতনামা ১৭৫ জনের বিরুদ্ধে হামলা ও অগ্নিসংযোগের মামলা করা হয়। উক্ত হামলায় অনিল বিকাশ চাকমার বাড়ী সম্পূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দেয় সেটেলার বাঙালিরা। দায়ের করা মামলায় বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সদস্য ও সমর্থক রয়েছে। এ মামলায় যাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে প্রচার করা হয়েছে সেই মোঃ কামাল হোসেনসহ আবেদ আলী মেম্বার, আবু হানিফ মেম্বার, কামরুল হাসান ওরফে আমান, আবু তাহের, এজাহারভুক্ত ১নম্বর আসামী তাইন্দং ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও মাটিরাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজী ও বাঙালি ছাত্র পরিষদের নেতা ও শিক্ষক মেহেদি হাসানসহ ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যায়। তবে ইতিমধ্যে অপর একজনসহ বাঙালি ছাত্র পরিষদের নেতা ও শিক্ষক মেহেদি হাসানকে আদালত থেকে জামিন দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়। এ নিয়ে ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাওয়া বিষয়ে জনমনে সংশয় দেয়া দিয়েছে।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী কর্তৃক ভাড়াতে দু'জন খুনি সেটেলার বাঙালি আটক

গত ১৮ আগস্ট ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৯:৩০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিমের নেতৃত্বে পুলিশ সংস্কারপন্থী কর্তৃক নিযুক্ত দুই ভাড়াতে খুনি সেটেলার বাঙালি সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করে। আটককৃত সন্ত্রাসীরা হল- ১) মোঃ আব্দুল জলিল (৪০) পিতা-মৃত মোঃ হোসেন, গ্রাম-হরকুমার কার্বারী পাড়া (সেটেলারদের নামকরণ ইসলামাবাদ), সোনাই, থানা-লংগদু। আব্দুল জলিল লংগদু থানার মোটর সাইকেল সমিতির সভাপতি এবং রাবেতা হাসপাতালের নাইটগার্ড। (২) মোঃ মাসুম (৩৫) পিতা-মৃত রসিক সরকার (প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান, লংগদু), গ্রাম-কড়ল্যাছড়ি, থানা-লংগদু। বর্তমানে সে তিনটিলা, লংগদু উপজেলা সদরে বসবাস করছে। আটককৃত দু'জনই বিএনপি রাজনীতির সাথে যুক্ত বলে জানা যায়।

জানা যায়, গ্রেফতারকৃত ঐ সন্ত্রাসীরা গত ১৫ জুন ২০১৩ লংগদু সদরের কাঠালতলার প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্য করুণ চাকমাকে গুলি করে হত্যা করার ঘটনায় জড়িত ছিল বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করে। আটককৃত ঐ ভাড়াতে খুনীরা স্বীকার করে যে, লংগদু এলাকার সংস্কারপন্থী চীফ কালেক্টর রাসেল চাকমার সাথে তাদের চুক্তি হয়। আটককৃতরা আরও জানায় যে, জনসংহতি সমিতি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের হত্যা করা জন্য সংস্কারপন্থী চক্রের সাথে তাদের (১) জনসংহতি সমিতির লংগদু থানা কমিটির সভাপতি ত্রিলোচন চাকমাকে গুলি করে হত্যা করতে পারলে নগদ ২ লক্ষ টাকা; (২) লংগদু থানার যুব সমিতির সভাপতি বিটু চাকমাকে গুলি করে হত্যা করতে পারলে নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং (৩) জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও যুব সমিতির সদস্য যে কাউকে হত্যা করতে পারলে প্রত্যেকের জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবে মর্মে সংস্কারপন্থীর চীফ কালেক্টর রাসেলের সাথে চুক্তি হয় বলে জানা যায়।

উল্লেখ্য, আটককৃত সন্ত্রাসীরা প্রথমে মুখ খুলতে না চাইলেও পরে রাসেলের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হবার সময় মোবাইলে আলাপ-আলোচনার রেকর্ডগুলো বাজিয়ে শুনানো হলে সব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এ সময় পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ লংগদু উপজেলার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলীকদমে সেটেলার ভূমিদস্যু বদিউল আলম কর্তৃক জুম্মদের ভূমি বেদখল

সেটেলার ভূমিদস্যু বদিউল আলম বদি আলীকদম উপজেলায় বসবাসরত জুম্মদের কাছে এক আতঙ্কের নাম। শুধু আলীকদম নয়, বান্দরবান জেলার সকলের কাছে বদিউল আলম বদি একজন ভূমিদস্যু হিসেবে লোক পরিচিত। আলীকদম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আসাদুজ্জামানের সহযোগিতায় ভূমিদস্যু বদিউল আলম চক্র একের পর এক জুম্মদের ভূমিসহ বাঙালিদের ভূমিও অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে।

জানা গেছে, কুমিল্লা জেলা সদরের রশিদ কানন এলাকার এম.এ রশিদের ছেলে বদিউল আলম বদি গত ৩/৪ বছর আগে বহিরাগত হিসেবে এসে আলীকদম উপজেলার আলীকদম-থানচি রোডে লীজ-বন্দোবস্তির নামে জুম্মদের জুম চাষের ভূমি জবরদখল শুরু করে। ভূমিদস্যু বদিউল আলম বদির সন্ত্রাসীরা স্থানীয় গ্রামবাসীদের নানা ভয়ভীতি হুমকি দিয়ে বিতাড়িত করে। এতে যুগ যুগ ধরে বসবাসরত ম্রো, ত্রিপুরা, মারমা জনগোষ্ঠীসহ কিছু বাঙালি পরিবারও উচ্ছেদ হয়ে যায়। এ নিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসীরা সংবাদ সম্মেলন, নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেও প্রতিকার পায়নি।

সেটেলার ভূমিদস্যু বদিউল আলম বদি লীজ-বন্দোবস্তির নামে শুধু আলীকদম-থানচি সড়কের আশপাশেই অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে প্রায় ১০ হাজার একর জমি। এতে করে সেখানে বসবাসরত জুম্ম পরিবারগুলো উচ্ছেদ হয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

রোয়াংছড়িতে বহিরাগত ভূমি আগ্রাসীদের কর্তৃক উচ্ছেদের আতঙ্কে ভুগছেন ৩৩ মারমা পরিবার

বান্দরবান জেলাধীন রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা মৌজাধীন ফাখ্যাংপাড়ায় অন্তত ৩৩ মারমা পরিবার বহিরাগত ভূমি আগ্রাসীদের ভূমি বেদখলের চেষ্টার কারণে উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ফাখ্যাংপাড়ার মারমারা কয়েক প্রজন্ম ধরে ঐ এলাকায় বসবাস করে আসছিল। এই গ্রামের তিন একর পরিমাণ ভূমি গ্রামের কার্বারী চাইথোয়াই উ মং এর নামে ১৯২৯ সালে রেকর্ডভুক্ত হয়, যার হোল্ডিং নং ৫৬। কিন্তু মোঃ সামাদ আলি নামের এক বাঙালি সেটেলার সম্প্রতি জনসমক্ষে দাবী করছে যে, ঐ ভূমির দুই-তৃতীয়াংশের মালিক সে।

আরও জানা যায় যে, ১৯৮৫ সালে মোঃ সামাদ আলি বান্দরবানের স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ৩৪৫ নম্বর হোল্ডিং নিয়ে গোপনে এই গ্রামের দুই একর ভূমি নিজের নামে রেকর্ডভুক্ত করে নেয়। এখন সে ফাখ্যাংপাড়া গ্রামবাসীদের চাপ দিচ্ছে যে, তারা যাতে ঐ ভূমি দ্রুত খালি করে দেয়। ফলে এই মারমা গ্রামবাসীরা এখন উচ্ছেদ আতঙ্কে ভুগছেন।

জানা যায়, এই ভূমি বেদখলকারী মোঃ সামাদ আলি এই গ্রামে আসে সমতল জেলা থেকে ১৯৮২-৮৩ সালে। প্রথম আসার পর সে স্থানীয় জুম্ম লোকদের নিকট আশ্রয় চায়। মারমা গ্রামবাসীরা তখন দয়া করে তাকে থাকা ও জীবিকার জন্য এক খন্ড ভূমি দেয়। কিন্তু এখন এই মোঃ সামাদ আলিই জুম্মদের ভূমি বেদখলের নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে এই ফাখ্যাংপাড়া গ্রামের ৩৩ মারমা পরিবার যে কোন মুহূর্তে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদ হওয়ার আতঙ্কে ভুগছে। মোঃ সামাদ আলির নেতৃত্বে ভূমি বেদখলের অপচেষ্টায় লিপ্ত দুষ্কৃতকারীরা প্রতিনিয়ত নিজেদের পিতৃভূমি ও বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের লক্ষ্যে গ্রামবাসীদের হয়রানি করে চলেছে।

গত ২৪ জুন ২০১৩ উক্ত জুম্ম মারমা গ্রামবাসীরা স্থানীয় সংসদ সদস্য বীর বাহাদুর এমপি, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, মৌজা হেডম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান-এর সুপারিশ নিয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি তুলে ধরে ভূমি বেদখলকারীদের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের দাবী জানিয়ে বান্দরবান জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট আবেদনপত্র পেশ করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উক্ত বেদখলের চেষ্টাকারীদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়নি এবং সমস্যাটির কোন সুরাহা হয়নি।

উচ্ছেদ আতঙ্কের সম্মুখীন উক্ত ৩৩ মারমা পরিবার হল- (১) রি অং কার্বারী, পীং-মৃত সাগ্য কার্বারী, (২) চাথোয়াই প্রু মারমা, পীং-মৃত থুই অং প্রু মারমা, (৩) তউং লুঙ্গ্যা মারমা, পীং-মৃত চাই থোয়াই মারমা, (৪) মংচোহ্লি মারমা, পীং-মৃত থুই অং প্রু মারমা, (৫) সাউচিং মারমা, পীং-মৃত নিওসাখই মারমা, (৬) প্রু সাচিং মারমা, পীং-মৃত নিওসাখই মারমা, (৭) ওথুই মারমা, পীং-সাউচিং মারমা, (৮) উ নু মং মারমা, পীং-সাউচিং মারমা, (৯) ক্যচিং নু মারমা, পীং-সাউচিং মারমা, (১০) ক্যচিং মং মারমা, পীং-মৃত মং সাগ্য মারমা, (১১) রিদাসে মারমা, পীং-চাথোয়াই উ মারমা, (১২) মংহা চিং মারমা, পীং-তং লুঙ্গ্যা মারমা, (১৩) মংচিং মারমা, পীং-মৃত ক্য উ চিং মারমা, (১৪) ক্য মং উ মারমা, পীং-মৃত থোয়াই মং মারমা, (১৫) সাই মং উ মারমা, পীং-মৃত মেথোয়াই মারমা, (১৬) মং মং চিং মারমা, পীং-নু ম্যামং মারমা, (১৭) আলুঙ মারমা, পীং-মৃত শয়েখ্য মং মারমা, (১৮) মংনু প্রু মারমা, পীং-নাজি রাং মারমা, (১৯) মং খেউ উ মারমা, পীং-মংচোরি মারমা, (২০) থুই ব্য মারমা, পীং-মৃত পাইহা অং মারমা, (২১) মংখ্যচিং মারমা, পীং-চাথোয়াই প্রু মারমা, (২২) খ্যবুমা মারমা, স্বামী-মৃত মং সাগ্য মারমা, (২৩) পুই সাং উ মারমা, স্বামী-মৃত মংসা থোয়াই মারমা, (২৪) মংভু মারমা, পীং-মৃত মং সানু মারমা, (২৫) মং চিং নু মারমা, পীং-চদং মং মারমা, (২৬) ম্রি মারমা, পীং-মৃত মং সাগ্য মারমা, (২৭) পাই নু মং মারমা, পীং- মকথো মারমা, (২৮) অহ্ন মারমা, স্বামী-সাউ চিং মারমা, (২৯) ক্যা থুই প্রু মারমা, পীং-উক্যচিং মারমা, (৩০) মংসাচিং মারমা, পীং-তং লুঙ্গ্যা মারমা, (৩১) উচাহা মারমা, পীং- হাচো মারমা, (৩২) উবাচিং মারমা, পীং-চোথোয়াই প্রু মারমা, (৩৩) মংসা প্রু মারমা, পীং-তং লুঙ্গ্যা মারমা।

রাঙামাটিতে হরতালের সময় এক জুম্ম তরুণ প্রহৃত

গত ১০ জুন ২০১৩ সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পার্বত্য জেলায় আহূত হরতালের দ্বিতীয় দিনে দুপুর প্রায় ১:৩০ টায় রাঙামাটি জেলা সদরের বনরূপা এলাকার বিএম মার্কেটের সামনে অমর শান্তি চাকমা ওরফে বাবু (১৭), গ্রাম-রেংখ্যং বাজার এলাকা, জীবতলি ইউনিয়ন নামের এক জুম্ম তরুণ কোন উস্কানি ছাড়াই একদল বাঙালি সেটেলারের বেদম প্রহারের শিকার হয়। ঐ অমর শান্তি চাকমা এ সময় পায়ে হেঁটে কাঠালতলী থেকে একা একা সমতাঘাটে যাচ্ছিল। প্রায় ৫০-৬০ সেটেলার বাঙালি অমর শান্তিকে ধাওয়া করে এবং কাঠ ও লাঠিসোটা দিয়ে পেছন দিক থেকে আঘাত করে। পালাতে সক্ষম হলেও অমর শান্তির মাথায়, বুকে ও পায়ে মারাত্মক জখম হয়।

নাইক্ষ্যংছড়িতে বহিরাগত ভূমিদস্যুদের কর্তৃক ভূমি বেদখল জোরদার

বান্দরবান পার্বত্য জেলাধীন নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় সম্প্রতি আবার ভূমি বেদখলের অপতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইসারি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ ফারুক আহমেদ ইউনিয়নের কামিকছড়া মৌজা এলাকায় আবার ভূমি বেদখলের তৎপরতা শুরু করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, এই সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বাগান করার উদ্দেশ্যে জুম্মদের ভোগদখলীয় ব্যাপক বনভূমি পরিষ্কার করার জন্য অনেক রোহিঙ্গা শ্রমিককে নিয়োগ করেছেন। স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রায় ১০০০ একর ভূমি ইতোমধ্যে বেদখল করা হয়েছে।

জানা যায়, গত ২ আগস্ট ২০১৩ স্থানীয় জুম্ম গ্রামবাসীরা কামিকছড়া মৌজায় বেদখলকৃত জায়গায় মোঃ ফারুক আহমেদ কর্তৃক অস্থায়ীভাবে নির্মিত বাড়ি ভেঙে দিয়েছেন। স্থানীয়রা আরও জানায় যে, নাইক্ষ্যংছড়িতে এই ভূমি বেদখল অব্যাহত থাকা এবং আরও জোরদার হওয়ার কারণ হচ্ছে, প্রশাসন কর্তৃক এ পর্যন্ত কোন ভূমি বেদখলকারীকে গ্রেফতার করা হয়নি।

উল্লেখ্য যে, এই মোঃ ফারুক আহমেদ কোন প্রকার আইন ও নিয়ম-কানুনকে তোয়াক্কা না করে ইতোমধ্যে নাইক্ষ্যংছড়ি ইউনিয়নের বাকখালী মৌজায় হাজার হাজার ভূমি বেদখল করেছেন। স্থানীয়রা জানায়, সাধারণত তিনি প্রথমে ভূমি বেদখল করেন এবং পরে বিভিন্ন বাণিজ্যিক কোম্পানী ও ব্যবসায়ীদের থেকে টাকা নিয়ে বাগান গড়ে তোলেন। একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে চারাগুলো বড় হলে ঐ বাণিজ্যিক কোম্পানী ও ব্যবসায়ীদের নিকট ঐ বাগান হস্তান্তর করেন।

স্থানীয় জুম্মদের আশঙ্কা, অচিরেই যদি এই ভূমিদস্যু মোঃ ফারুক আহমেদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হয়, তাহলে শীঘ্রই হাজার হাজার জুম্ম তাদের পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হবে।

চট্টগ্রামের সিইপিজেড এলাকায় জুম্ম শ্রমিকের উপর হামলা

গত ২৩ আগস্ট ২০১৩ চট্টগ্রামের বন্দর এলাকাস্থ বস্ত সুজ ফ্যাক্টরিতে একজন জুম্ম শ্রমিকের কাজ শেখাকে কেন্দ্র করে ঐ ফ্যাক্টরিতে কর্মরত কয়েকজন জুম্ম শ্রমিকসহ পুষ্প রতন চাকমার (২১) সাথে অপারেটর মোঃ রহান (২২) এর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। জুম্ম শ্রমিক পুষ্প রতন চাকমা খুব সহজে কাজ আয়ত্ত করতে না পারায় তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করলে অপারেটরের সাথে তার বাকবিতণ্ডা হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেদিন ছুটির পর পুষ্প রতন চাকমাকে কয়েকজন অপরিচিত বাঙালি ছেলে মারধর করে। পরের দিন জুম্ম শ্রমিকরা অপারেটরের এমন আচরণ এবং পুষ্প রতন চাকমাকে মারধর করার ঘটনা তাদের ফ্যাক্টরি ম্যানাজারকে অবহিত করেন। অফিসের একজন স্টাফ উভয় পক্ষের সাথে কথা বলে তা মিটমাট করে দেন। ঘটনার পর থেকে ঐ অপারেটর কাজে অনুপস্থিত থাকে। ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে ঐ অপারেটরের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা কেউ জানে না। ঐ দিন রাত ৮/৯:০০ টার দিকে জুম্ম শ্রমিকেরা কাজ থেকে ফেরার সময় ঝনক প্লাজার সামনে আসলে তাদের উপর ২০/২৫ জন অপরিচিত বাঙালি দা, ছুড়ি, লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা করে। এতে ২১ জন জুম্ম শ্রমিক আহত হয়। তাদের মধ্যে ১৪ জনকে মারাত্মক আহত অবস্থায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাকী ৭ জনকে ব্যারিস্টার কলেজ এলাকার দত্ত ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।

আহত শ্রমিকরা হল-১) বিকাশ চাকমা (২৪), পিতা-প্রিয় জীবন চাকমা, (২) লক্ষী সেন চাকমা (২৩), পিতা-সুমিত্র লাল চাকমা, (৩) তোহেল চাকমা (২৪), পিতা-সাগর ভাসা চাকমা, (৪) শুভ রতন চাকমা (২৬), পিতা-লোলিত কুমার চাকমা, (৫) জগদীশ চাকমা (২৭), পিতা-নেকরে কুমার চাকমা, (৬) ঋন্ত চাকমা (২৫), পিতা-চিনাকর চাকমা, (৭) বিমল কান্তি চাকমা (২৩), পিতা-শাক্য চাকমা, (৮) কিরণ জ্যোতি চাকমা (২৪), পিতা-নিত্যানন্দ চাকমা, (৯) পন্তি দেওয়ান (২২), পিতা-তাপস দেওয়ান, (১০) নিশান চাকমা (২৩), পিতা-রুমেশ চাকমা, (১১) মনি চাকমা (২৩), পিতা-প্রভাত চন্দ্র চাকমা, (১২) প্রদীপ চাকমা (২২), পিতা-শান্তশীল চাকমা, (১৩) নরেশ চাকমা (২৫), পিতা-ছন্দ পতন চাকমা, (১৪) তিলক চাকমা (২৬), পিতা- অভিলেশ্বর চাকমা, (১৫) সন্তু চাকমা (২৪), পিতা-সিংহ মনি চাকমা, (১৬) মিঠু চাকমা (২৭), পিতা-সুনীল কান্তি চাকমা, (১৭) সুমন চাকমা (২৪), পিতা-নয়ন চাকমা, (১৮) রিপন চাকমা (২৪), পিতা-কর্ম বিকাশ চাকমা, (১৯) সোহেল চাকমা (২৫), পিতা- ধননজয় চাকমা, (২০) ঈস্টন চাকমা (২৮), পিতা-চিন্তামনি চাকমা, (২১) তপন চাকমা (২৩), পিতা-সাধন বিকাশ চাকমা। আহত শ্রমিকদের সকলের ঠিকানা বস্ত সুজ ফ্যাক্টরি হোস্টেল এবং ব্যারিস্টার কলেজ এলাকায়।

পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম এর নেতৃবৃন্দ এবং স্থানীয় লোকজন ঘটনাটি ইপিজেড থানায় অবগত করেন। পরে পুলিশ দত্ত ফার্মেসিতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেওয়া আহত ৭ জন শ্রমিককে চিকিৎসা করানোর নামে একটি ভ্যান গাড়িতে তুলে নিয়ে বন্দর থানায় আটকে রাখে, এমনকি নির্যাতন করে। এতে ঘটনার প্রতিবাদে ২০-২৫ হাজার পাহাড়ি শ্রমিক একদিন কর্ম বিরতি পালন করে। পরদিন ২৫ আগস্ট ২০১৩ বেপজা অফিসের মালিক পক্ষ, পাহাড়ি-বাঙালি শ্রমিক প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এক সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উভয় পক্ষ একটা সিদ্ধান্তে পৌছলে আটক ৭ জন পাহাড়ি শ্রমিককে ছেড়ে দেয় পুলিশ।

বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তবলী হল-১) এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা পুনরায় ঘটবে না মর্মে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস, (২) ২৫ আগস্ট ২০১৩ রোববার কাজে অনুপস্থিত পাহাড়ি শ্রমিকদের কাছ থেকে কোন বেতন কেটে নেওয়া হবে না, (৩) পাহাড়ি শ্রমিকদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করা হবে, (৪) আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যয়ভার মালিক পক্ষ বহন করবে। চিকিৎসাকালীন অনুপস্থিতিতেও শ্রমিকদের বেতন এবং সুযোগ সুবিধাদি ফ্যাক্টরি থেকে প্রদান করা হবে, (৫) পাহাড়ি শ্রমিকরা ২৬ আগস্ট ২০১৩ থেকে কাজে যোগদান করবে।

এইসব সিদ্ধান্তের আলোকে পাহাড়ি শ্রমিকরা তাদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে নেয়। তবে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, মালিক পক্ষ এবং প্রশাসন পাহাড়ি শ্রমিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বললেও এখন পর্যন্ত পাহাড়ি শ্রমিকরা অপরিচিত বাঙালি সন্ত্রাসী কর্তৃক চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হচ্ছেন। কয়েকটি ফ্যাক্টরি বাদে বাকী ফ্যাক্টরিগুলোতে অনুপস্থিতির বেতন কেটে নেওয়া হয়েছে। নানাভাবে পাহাড়ি শ্রমিকদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম এবং এলাকাবাসীরা মিলে বন্দর জোনের পুলিশের ডিসি বরাবর পাহাড়ি শ্রমিকদের নিরাপত্তা চেয়ে একটি আবেদন পত্র দেওয়া হয়।

লামায় ভূমিদস্যু মুজিবুল হকের সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবরদখল ও হামলা

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সকাল ৮.০০টায় ভূমিদস্যু সেটেলার বাঙালি মুজিবুল হক মাস্টার (মুজিবুল লিডার) এর নেতৃত্বে ২০-৩০ জনের একটি সন্ত্রাসী দল বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের পলিঝিড়ি (পলিক্ষ্যং) এলাকায় জুম্মদের ভূমি জবরদখল করতে গেলে জুমে কর্মরত জুম্মদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় ২ মহিলাসহ ৮ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয়। সন্ত্রাসীরা জুম্মদের জুমঘরও ভেঙ্গে দেয়।

এ ঘটনায় মুজিবুলের লোকেরা পথে যে সমস্ত জুম্মকে পেয়েছে, তাদের উপরও দা-লাঠি দিয়ে হামলা চালায়। প্রথমে তারা জুম্মদের উপর মরিচের গুড়ো ছিটিয়ে দেয় এবং তারপর দা-লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। এতে হাচাই পাড়ার বেশ কয়েকজন জুম্ম গুরুতরভাবে আহত হয় এবং তাদেরকে লামা সরকারী সদর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া আহত ব্যক্তিরা হল-১) মংসানু মারমা (২৫) পীং-ক্যশৈপ্রু মারমা, (২) অংহ্লাপ্রু মারমা (২৬) পীং-মংএ মারমা, (৩) উশৈহ্লা মারমা (২৬) পীং-ক্যচিংসা মারমা; (৪) মংম্রাথোয়াই মারমা (২৪) পীং-মিইমং মারমা, (৫) চমেথুই মারমা (২৫) পীং ক্যহাউ মারমা (মহিলা), (৬) অংক্যথোয়াই মারমা (২৮) পীং মংচাইথুই মারমা (৭) মংওয়াইউ মারমা (৩০) পীং মংচাইথুই মারমা ও (৮) নাপ্রু মারমা (২৯) পীং হাথোয়াইচিং মারমা (মহিলা)।

এছাড়া সেই বাঙালীরা টিয়ার ঝিড়ি (লংক্ষ্যং) পাড়ার ৩ পাড়াবাসী বন্য শুকর শিকার করতে গেলে পথে তাদের উপরও হামলা চালিয়ে মারাত্মক আহত করে স্থানীয় আর্মীদের হাতে তুলে দেয়। পলিঝিড়ির ঘটনার সাথে এই জুম্ম গ্রামবাসীদেরও জড়িত করে দেয়ার চেষ্টা করে। পরে আহতরা স্থানীয় দড়দড়ি হাসপাতালে ভর্তি হয় বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, ২৯৪ নং দড়দড়ি মৌজার পলিঝিড়ি এলাকায় উশৈহ্লা মারমাসহ হাচাই পাড়াবাসীর বাগান ও জুম রয়েছে। ইতিপূর্বে মুজিবুল গ্রুপের লোকেরা আরো একবার ঐ জায়গা বেদখলের চেষ্টা করে জুম্ম গ্রামবাসীর বাধা দেয়ার কারণে ব্যর্থ হয়। ভূমিদস্যু মজিবুল হকের সন্ত্রাসী গ্রুপের লোকেরা এলাকায় ভূমি জোরপূর্বক দখল করে বাইরের কোম্পানীর হাতে তুলে দিত। সাম্প্রতিককালে বান্দরবান জেলার লামা, আলিকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি ইত্যাদি উপজেলায় বহিরাগত ভূমিদস্যু, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও প্রভাবশালী মহল স্থানীয় প্রশাসনের ছত্রছায়ায় জুম্মদের রেকর্ডীয় ও ভোগদলীয় জমি জবরদখল করে চলেছে।

উক্ত হামলার ঘটনায় নাপ্রুঅং মারমা গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ লামা থানায় ভূমিদস্যু মজিবুল হক ও তার ছেলে মোঃ জহির (৩৫) সহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ১৩ জনকে আটক করেছে বলে দাবী করলেও হামলার মূল হোতা মুজিবুল হক ও তার ছেলেকে গ্রেফতার করেনি। তারা এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে ঘোরাফেরা করছে।

জুম্ম নারীর উপর যৌন হয়রানি, সহিংসতা, ধর্ষণ ও হত্যা

আদিবাসী জুম্ম নারীর উপর সহিংসতা যেমন ধর্ষণ, হত্যা, অপহরণ এখনও অব্যাহতভাবে সংঘটিত হয়ে চলেছে। আদিবাসী জুম্ম নারীর উপর সহিংসতার উপর ধর্ষণ ও অন্যান্য সহিংসতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে যে, অপরাধীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় না আনা। গত ১ জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ৩১ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত ১০ মাসে ২ জন জুম্ম নারী ও শিশুকে হত্যা, ৭ জনকে ধর্ষণ, ৫ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা বা যৌন হয়রানি, ৪ জনকে অপহরণ ও ৫ জনকে হামলা বা নির্যাতন (মোট ২৪ জুম্ম নারী ও শিশু) করা হয়। নিম্নে মে ২০১৩ হতে অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত নারীর উপর সহিংসতার রিপোর্ট তুলে ধরা হলো-

গুইমারায় সেটেলার কর্তৃক এক মারমা আদিবাসী নারী ধর্ষিত

গত ২১ মে ২০১৩ বিকাল ৫টায় খাগড়াছড়ি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুইমারা মৌজাধীন দেওয়ান পাড়ায় নিজ বাড়িতে এক মারমা আদিবাসী নারী সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হয়। জানা যায়, ঘটনার সময় রামগড় উপজেলার লুব্রেমরম মৌজার বড়তলী হাজীপাড়া গ্রামের সেটেলার মোঃ সিরাজুল হকের ছেলে মোঃ ফজরুল রহমান (৪০) ওই নারীকে বাড়ীতে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। এ সময় ওই মহিলার চিৎকারে গ্রামের লোকজন পালিয়ে যাবার সময় ধর্ষক মোঃ ফজরুল রহমানকে ধরে গণপিটুনি দেয়। পরে রাত সাড়ে ১০টায় পুলিশ গিয়ে গ্রেফতার করে। এ ঘটনায় ধর্ষিত ওই নারী গুইমারা থানায় নারী ও নির্যাতন দমন আইন (সংশোধন)-২০০৩ এর ৩০৪(খ) ধারায় (মামলা নং-১ তারিখঃ ২১/০৫/২০১৩) মামলা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত মোঃ ফজরুল রহমানকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

বান্দরবানের রাজভিলায় এক জুম্ম নারী ধর্ষিত হওয়ার অভিযোগ

২০১৩ সালের জুন মাসে বান্দরবান জেলার সদর উপজেলাধীন রাজভিলা এলাকায় এক মারমা গৃহবধূ কয়েক জন সশস্ত্র রোহিঙ্গা জঙ্গী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন বলে জানা যায়। তবে পারিবারিক বাধার কারণে ঘটনাটি কোন সংগঠন বা সংবাদ মাধ্যমে জানানো হয়নি। উল্লেখ্য, রাজভিলা এলাকাটি রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম জেলার সীমানায় অবস্থিত।

খাগড়াছড়িতে দাঙ্গা পুলিশের গুলিতে এক আদিবাসী নারী আহত

গত ৩০ জুন ২০১৩ সকাল প্রায় ১০:৩০ টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের দক্ষিণ খবংপয্যা এলাকায় দাঙ্গাপুলিশের রাবার বুলেটের আঘাতে চঞ্চলা চাকমা (৫০) নামের এক নিরীহ আদিবাসী নারী মারাত্মকভাবে জখম হন। উল্লেখ্য, ঐ দিন

খাগড়াছড়িতে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ডাকে সড়ক অবরোধ চলাকালে পিকেটারদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। পিকেটাররা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশ সকাল ১১টার দিকে পিকেটারদের ধাওয়া করে দক্ষিণ খবংপয্যা গ্রামে ঢুকে পড়ে। এসময় পুলিশ এলোপাতাড়ি রাবার বুলেট ছুড়তে থাকে। এতে পুলিশের গুলিতে পেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মক আহত হন নিরীহ পথচারী চঞ্চলা চাকমা। ঘটনার সময় তিনি ক্ষেতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পরে চঞ্চলা চাকমাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং দু'দফা অপারেশনের পর তার শরীর থেকে ছয়টি গুলি অপসারণ করা হয়।

শুভলং-এ বাঙালি সেটেলার যুবক কর্তৃক এক জুম্ম শিশু ধর্ষণের শিকার

গত ২৫ জুলাই ২০১৩ দুপুর আনুমানিক ১:০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন শুভলং ইউনিয়নের অন্তর্গত রূপবানমুখ নামক স্থানে মোঃ মালেক (২০) পীং-মোঃ ইদ্রিস নামের এক বাঙালি সেটেলার যুবক কর্তৃক ১৩ বছর বয়স্ক এক জুম্ম শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের শিকার জুম্ম নারী শিশুটি স্থানীয় পেত্যাছড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী। ধর্ষণকারী মোঃ মালেক এখনও গ্রেফতার হয়নি।

জানা গেছে, ঐ দিন দুপুর ১২:০০ টার দিকে ঐ জুম্ম শিশুটি নিজেদের ছাগল খুঁজতে তার গ্রাম পেত্যাছড়ি থেকে নৌকাযোগে পার্শ্ববর্তী রূপবানমুখ নামক স্থানে যায়। সেখানে সে নিকটবর্তী বরুণাছড়ি সেটেলার এলাকার বাসিন্দা মোঃ মালেককে দেখতে পায় এবং কোন ছাগল দেখেছে কিনা মোঃ মালেকের কাছে জানতে চায়। মোঃ মালেক পার্শ্ববর্তী জঙ্গল দেখিয়ে সেই দিকে ছাগল চড়তে দেখেছে বলে জবাব দেয়। এরপর জুম্ম শিশুটি সেই জঙ্গলের দিকে গেলে তার পিছু পিছু মোঃ মালেকও যায়। এক পর্যায়ে মোঃ মালেক ঐ শিশুটিকে ধর্ষণ করে। তবে শিশুটি হাতের বৈঠা দিয়ে মোঃ মালেককে আঘাত করলে মালেক সেখান থেকে চলে যায়।

এরপর ধর্ষিতা শিশুটি বাড়িতে ফিরে আসে এবং মা-বাবাকে ঘটনাটি খুলে বলে। ঘটনাটি জানার পর, ধর্ষিতার মা-বাবা এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় বরুণাছড়ি এলাকার বাঙালি নেতা আলম ফরাজীর কাছে যায় এবং ঘটনার ব্যাপারে তাকে অবহিত করে। ঐ দিন বিকাল ৪:০০ টায় বাঙালি নেতা আলম ফরাজীর আহ্বানে বরুণাছড়ি বাজারে পাহাড়ি-বাঙালিদের এক সালিশের আয়োজন করা হয়। সেখানে ধর্ষণকারী মোঃ মালেককেও হাজির করা হয়। সালিশে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে মোঃ মালেক দোষ স্বীকার করে। এতে বাঙালি নেতারা মোঃ মালেককে কয়েক দফা চর-থাপ্পর মারেন এবং ধর্ষিতার পরিবারকে ৫ হাজার টাকা দিয়ে আপোষ করার প্রস্তাব দেন। তবে ধর্ষিতার পরিবার টাকা না নিয়ে এবং কোন কথা না বলে বাড়িতে ফিরে আসেন।

২৬ জুলাই ২০১৩ ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য ধর্ষিতাকে রাঙ্গামাটি নিয়ে আসা হয়। এরপর ৩০ জুলাই ২০১৩ ধর্ষিতার বাবা শুভ রঞ্জন চাকমা বাদী হয়ে এ ব্যাপারে বরকল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর ০১, তারিখ ৩০/০৭/২০১৩ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধন ২০০৩) এর ধারা ৯(১)।

রাঙামাটিতে এক বাঙালি সেটেলার কর্তৃক এক পাংখোয়া স্কুল ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা

গত ২৯ জুলাই ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১১:০০ টায় এক বাঙালি সেটেলার রাঙামাটি শহরের রাঙামাটি পুলিশ লাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এক স্থান থেকে ১১ বছর বয়সী এক পাঙখোয়া স্কুল ছাত্রীকে অপহরণের চেষ্টা করে। ঐ পাঙখোয়া ছাত্রীটি রাঙামাটি মিশন স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে।

অপহরণের সময় ছাত্রীটি চিৎকার করলে স্থানীয় জুম্ম ও বাঙালি অধিবাসীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে ছাত্রীটিকে উদ্ধার করে। অপরদিকে অপহরণকারী বাঙালি সেটেলারটি দ্রুত পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, পাংখোয়া ছাত্রীটি এ সময় প্রাইভেট ক্লাস শেষ করে বাড়িতে ফিরছিল। ঐ দিন ছাত্রীটির অভিভাবক কোতয়ালী থানায় ঘটনাটি অবহিত করলেও এ ব্যাপারে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি।

তবে গত ৩১ জুলাই ২০১৩ উক্ত ছাত্রীকে উদ্ধারকারী স্থানীয় জুম্ম ও বাঙালি অধিবাসীরা আপার রাঙামাটির ডিসি বাংলো এলাকার নিকটবর্তী জেলে বসতি এলাকা থেকে অপহরণের চেষ্টাকারী বাঙালি সেটেলারকে ধরে ফেলে আটক করে। জানা যায়, ঐ বাঙালি সেটেলারের নাম মোঃ আরিফ, সে চট্টগ্রাম জেলার মহেশখালী এলাকা থেকে এসেছে এবং এখানে সে জেলে পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। পরে আটককারীরা ঐ মোঃ আলীকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে।

মাটিরাঙ্গায় পুলিশ কর্তৃক এক জুম্ম গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা

গত ২ আগস্ট ২০১৩ রাত প্রায় ৮:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলাধীন বাল্যাছড়ি এলাকায় জনৈক পুলিশ কর্তৃক এক আদিবাসী মারমা গৃহবধূ (২০) ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়। ঘটনাটি ঘটে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম সড়কস্থ কবুতরছড়া যাত্রী ছাউনির নিকটবর্তী ঐ গৃহবধূরই বাড়ি-কাম-দোকানে। এ সময় ঐ গৃহবধূর স্বামী বাড়িতে ছিল না।

জানা যায়, ধর্ষণের চেষ্টাকারী গুইমারা থানাধীন ঐ পুলিশ কনস্টেবলের নাম বকুল। সে এ সময় রাস্তায় টহল দিচ্ছিল। পুলিশটি প্রথমে দোকানের রান্নাঘরে প্রবেশ করে ঐ গৃহবধূকে একা পেয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এতে গৃহবধূটি চিৎকার করলে নিকটবর্তী অবস্থান করা গৃহবধূর দেবর মংহা প্রু মারমা সেখানে ছুটে আসে। আর পুলিশটি তখন অবস্থা বেগতিক দেখে পালিয়ে যায়।

ঘটনাটি জানাজানি হলে, গুইমারা থানার এক পুলিশ কর্মকর্তাও সেখানে ছুটে আসেন। ঐ পুলিশ কর্মকর্তাকে ঘটনাটি অবহিত করা হয়। তবে তারা ঐ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছেন বলে জানা যায়নি।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক পঞ্চম শ্রেণীর এক জুম্ম ছাত্রী অপহৃত

গত ১০ আগস্ট ২০১৩ দিবাগত রাতে রাঙ্গামাটি'র লংগদু উপজেলার আটারকছড়া ইউনিয়নস্থ ৫ নং ওয়ার্ডের চাদারাছড়ার প্রভাত চাকমার মেয়ে ভাঙ্গামুড়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ইলিকা চাকমাকে (১৩) সেটেলার বাঙালি মোঃ কামাল (৩০) পিতা-মোঃ গণি কর্তৃক অপহৃত হয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা যায়, গত ৪ আগস্ট ২০১৩ বিকালে মোঃ কামাল মাছ ধরার জন্য প্রভাত চাকমাদের এলাকায় আসে। পরে প্রভাত চাকমার বাড়িতে সেদিন থেকে ৬ আগস্ট ২০১৩ পর্যন্ত অবস্থান করে। ৭ আগস্ট ২০১৩ সকালে ঈদে মোঃ কামাল তার বাড়িতে চলে যায়। সে মুঠোফোনে প্রভাত চাকমা ও তার স্ত্রীকে ৯ আগস্ট ২০১৩ ঈদের নিমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু এ সময় প্রভাত চাকমা তার স্ত্রীসহ বাড়ী থাকবেন না বলে জানান।

মোঃ কামাল ইলিকা চাকমার মা-বাবার অনুপস্থিতির সুযোগে গত ১০ আগস্ট ২০১৩ শনিবার রাতে তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে গ্রামবাসীর ধারণা। ঘটনাটি জানাজানি হলে গ্রামবাসীরা ইলিকা চাকমাকে অপহরণে জন্য মোঃ কামাল এর সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি নিশ্চিত হয়। এ ব্যাপারে প্রভাত চাকমা লংগদু থানায় জিডি করেন। যার নম্বর-জিডি নং-৪৩৪, তারিখ-১৪/০৮/২০১৩। কিন্তু দোষী কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেননি।

লংগদুতে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ১১ বছরের জুম্ম শিশু ধর্ষিত

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলায় বগাচদর ইউনিয়নের রাঙ্গীপাড়া গ্রামের ১১ বছরের এক আদিবাসী চাকমা শিশুকে মোঃঃ জহির (৪৫) পিতা আবদুল আজিজ নামে একজন সেটেলার বাঙালি কর্তৃক ধর্ষণ করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে যে, ঘটনার শিকার শিশুটি একজন মৃগী রোগী। প্রতিবেশী সেটেলার বাঙালি মোঃ জহির মৃগী রোগের চিকিৎসা করতে পারে এমন খবর পাওয়ার পর শিশুটির

মা-বাবা ঘটনার ৪/৫ দিন আগে তার থেকে চিকিৎসা শুরু করে। সেদিন ১১ সেপ্টেম্বর সকাল ৯:০০ ঘটিকায় মোঃ জহির এসে বলে যে, রোগীটিকে ঝাড়ফুক দিতে হবে। তাই তাকে কলাবাগানের দিকে নিয়ে যেতে হবে বলে জানায়। সে সময় শিশুটির পিতা পত্য কুমার চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। শিশুটির মা চিকিৎসার কথা ভেবে কলাবাগানের দিকে নিয়ে যেতে অনুমতি দেয়। এরপর মোঃ জহির কলাবাগানে নিয়ে শিশুকে ধর্ষণ করে।

পরে আহত অবস্থায় বাড়িতে ফিরে শিশুটি তার মাকে বিষয়টি জানায়। এক পর্যায়ে বিষয়টি জানাজানি হলে বগাচদর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার (সেটেলার) দেওয়ান মনসুর আহমেদ চৌধুরী সালিশের মাধ্যমে সমাধান করার জন্য শিশুর মা-বাবা ও জুম্ম গ্রামবাসীদের চাপ দিতে থাকে। গত ১২ সেপ্টেম্বর ১১:০০ ঘটিকায় রাঙ্গীপাড়া স্কুলে দেওয়ান মনসুর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে সালিশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সালিশে অভিযুক্ত মোঃ জহিরকে কয়েক বেত মারা হয় এবং ৬০,০০০ টাকা জরিমানা ধার্য করা হয় বলে জানা যায়। ৬০,০০০ টাকা জরিমানা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রদানের দিন ধার্য করা হয়।

ঘটনাটি জানার পর ১৩ সেপ্টেম্বর লংগদু থানা থেকে একদল পুলিশ রাঙ্গী পাড়ায় যায় এবং শিশুটির বাবা পত্য কুমার চাকমাকে থানায় নিয়ে আসেন। পরে পত্য কুমার চাকমা লংগদু থানায় একটি মামলা করেন। তবে অভিযুক্ত মোঃ জহিরকে এখনো পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি বলে জানা গেছে।

দীঘিনালায় অসামাজিক কাজে লিপ্ত এক সেনা সদস্য গ্রামবাসীর হাতে আটক

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের জারুলছড়ি সেনা ক্যাম্পের সুবেদার আকবর পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক জুম্ম নারীকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকার সময় গ্রামবাসীর হাতে আটক হয়। পরে গ্রামবাসীরা তাদের কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে ছেড়ে দেয়।

এ ঘটনার বিষয়ে এলাকার মুরুব্বীরা দীঘিনালা জোনের সিও'র সাথে যোগাযোগ করলে সিও সুবেদার আকবরকে জোন হেডকোয়ার্টারে খোঁজ করে। আর এই অসামাজিক কার্যকলাপকে ধামা-চাপা দিতে এবং কোন প্রতিবাদ না করার জন্য এলাকার মুরুব্বীদের জানিয়ে দেয়।

বিলাইছড়িতে প্রাথমিক শিক্ষক কর্তৃক জুম্ম শিশু যৌন হয়রানির শিকার

স্থানীয় জনগণের প্রতিবাদের মুখে শিক্ষক গ্রেফতার

গত ৪ অক্টোবর ২০১৩ রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদরের বিলাইছড়ি বাজার এলাকায় বিলাইছড়ি প্রাথমিক মডেল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর একজন জুম্ম ছাত্রী (১১ বছর) তারই স্কুল ও প্রাইভেট শিক্ষক মোঃ কাওসার আলি ওরফে কাওসার মাস্টার কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। পরে স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের কর্তৃক আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ মিছিলের মুখে পুলিশ অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করে। জানা যায়, ঐ দিন বিকেল বেলা সেই ছাত্রীটি তাদের বাড়ি থেকে সামান্য দূরে একটি স্থানে খেলা করছিল। এমন সময় বিলাইছড়ি মডেল স্কুলের সহকারী শিক্ষক ও ঐ ছাত্রীর প্রাইভেট শিক্ষক মোঃ কাওসার আলি ঐ ছাত্রীর কাছে চলে আসে এবং এক পর্যায়ে ছাত্রীর শরীরের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করে যৌন হয়রানি চালায়। এতে ছাত্রীটি কান্না শুরু করে দিলে শিক্ষক ছাত্রীটির হাতে কিছু টাকা গুঁজে দেয় এবং এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করে। এরপরই ছাত্রীটি বাড়ি ফিরে আসে এবং মা-বাবার কাছে ঘটনাটি খুলে বলে। পরে জানা যায় যে, শুধু ঐ ঘটনাই নয়, প্রাইভেট পড়ানোর সময় ঐ শিক্ষক বেশ কিছু দিন ধরে অন্যান্য ছাত্রীদের সাথেও এ ধরনের ব্যবহার করে আসছিল, যা কেউ মুখ ফুটে বলতে পারেনি।

এদিকে গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে বিলাইছড়ি পুলিশ মোঃ কাওসার আলিকে গ্রেফতার করে। ছাত্রীর মা অরুণাদেবী চাকমা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ধারা ১০-এর অধীনে এ ব্যাপারে বিলাইছড়ি থানায় একটি মামলা দায়ের করেন এবং মামলার নম্বর ০১, তারিখ ০৬/১০/২০১৩।

প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন

রাঙামাটিতে সেনাবাহিনী কর্তৃক ৯ নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী নির্যাতিত

গত ৩০ মে ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১১:৩০ টায় শুভলং আর্মি ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা রাঙ্গামাটি সদর উপজেলার বসন্তপাড়া লিচুবাগান এলাকায় নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসীদের ডেকে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে শারীরিক নির্যাতন চালায়। এতে কমপক্ষে ১০ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী মারাত্মক আহত হয়।

জানা যায়, কালপতি চাকমা নামক এক ব্যক্তির নামে সেনাবাহিনীর কাছে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ থাকার কথা বলে দুপুরের দিকে শুভলং সেনা ক্যাম্পের একদল সেনা সদস্য জুম্মদের গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের ডেকে এনে এক জায়গায় জড়ো করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এ ঘটনায় গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। কিছু বুঝে উঠার আগেই গ্রামের লোকজনকে ধরে সেনা সদস্যরা এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। এ সময়ে সেনা সদস্যদের নির্যাতনে কমপক্ষে ১০ জন নিরীহ গ্রামবাসী মারাত্মক আহত হয়। এলাকাবাসীরা সেনাবাহিনীকে জানায় যে, তাদের গ্রামে কালপতি চাকমা নামে কেউ নেই। তবে কালোবাদি চাকমা নামের একজন আছে। পরে সেনা সদস্যরা কালোবাদি চাকমার বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি চালায়। এ সময়ে বাড়িতে কেউ ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী জানান, সেনা সদস্যরা তল্লাশির নামে কালোবাদি চাকমার ঘরের আসবাবপত্র ব্যাপক ভাঙচুর চালায়।

সেনাবাহিনীর নির্যাতনে আহত নিরীহ গ্রামবাসীরা হল-১) লক্ষী কুমার চাকমা (২৭) পিতা-মৃত ফুলেশ্বর চাকমা, গ্রাম-ইন্দ্র মনি পাড়া, ৮ নং ওয়ার্ড (২) আনন্দ চাকমা (৩৬), পিতা-মৃত পাত্থর চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঐ (৩) শান্তি বিকাশ চাকমা (২৮), পিতা-সুবল চন্দ্র চাকমা, গ্রাম-ঐ (৪) কনক বরণ চাকমা (২৫), পিতা- ফরা চাকমা, গ্রাম-ঐ (৫) সূর্য চাকমা (২৮) পিতা-মৃত পাগলা চাকমা, গ্রাম-ঐ, (৬) রবি চন্দ্র চাকমা (৩৬), পিতা-মৃত মনুরাম চাকমা, গ্রাম- ঐ, (৭) বন কুমার চাকমা (৩০), পিতা-মৃত পাত্থর মনি চাকমা, গ্রাম-জারলছড়ি, ১ নং ওয়ার্ড, (৮) সত্য জ্যোতি চাকমা (৩৬), পিতা-বাইত্যা চাকমা, গ্রাম-চংড়াছড়ি, বন্দুকভাঙ্গা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা। তিনি ওই গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন। (৯) অনিল চাকমা (৩০) গ্রামপুলিশ সদস্য, পিতা-দফাদার চাকমা, গ্রাম-কাইন্দা মুখ পাড়া।

দীঘিনালায় জুম্ম শরণার্থীদের জমি ফেরত না দিয়ে উল্টো বিজিবি হেডকোয়ার্টার স্থাপনের প্রক্রিয়া

খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার দীঘিনালা ইউনিয়ন ও দীঘিনালা মৌজার যত্ন কুমার কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়ায় একটি সেনা ও আর্মড পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে যার নাম বাবুছড়া আর্মী ক্যাম্প নামে প্রচলিত আছে। ১৯৮৬ সালে যত্ন কুমার কার্বারী পাড়া ও শশী মোহন কার্বারী পাড়াবাসীরা সবাই যখন প্রতিবেশী দেশে শরণার্থী হতে বাধ্য হয়েছিল এবং পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তপ্ত ঠিক সেই সময়ে সেই গ্রাম দুটিতে ঐ সেনা ক্যাম্পটি স্থাপন করা হয়।

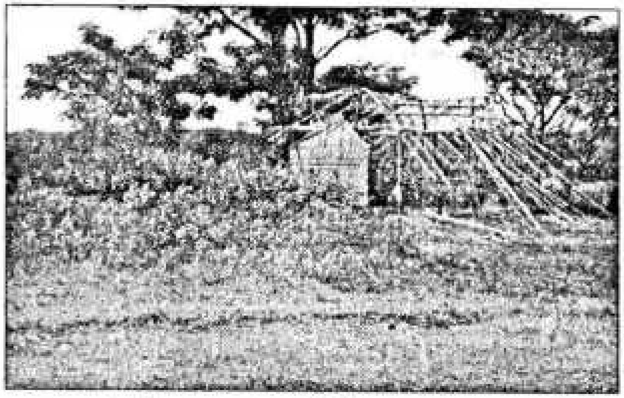

সেসময় ক্যাম্পটি যত্ন কুমার কার্বারী পাড়ার মনো রঞ্জন চাকমার রেকর্ডীয় ২.০০ একর টিলা জমিতে স্থাপন করা হয় এবং জমির মালিক মনোরঞ্জন চাকমাকে তখন থেকে জমির বর্গা দিয়ে আসা হচ্ছিল। পরবর্তীতে শরণার্থীরা যখন ২০ দফা প্যাকেজ চুক্তিতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে, তখনই দুই গ্রামের মোট ৫৮ পরিবার তাদের নিজ নিজ গ্রামে বসতবাড়ী গড়তে চায়। কিন্তু ক্যাম্পের সেনারা তাদের গ্রামে ঘর তুলতে বাধা প্রদান করে। ফলে ঐ ৫৮ পরিবার তাদের পুরানো গ্রামে এখনও ফিরে যেতে পারেনি। তারা বর্তমানে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মনোরঞ্জন চাকমার রেকর্ডীয় ২.০০ একর জমি ছাড়াও দুই গ্রামে অন্তর্ভুক্ত মোট ৩১.৬৩ একর জমি সামাজিক মালিকানাধীনে আছে।

সরকার বিগত ২০০5 সাল থেকে উক্ত সামাজিক মালিকানাধীন জমিতে একটা বিজিবি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ৫৮ পরিবার বাস্তুহারা গ্রামবাসীকে সরকার তাদের জায়গায় পুর্নবাসন না করে উল্টো ঐ বিজিবি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা যায়। সে লক্ষ্যে গত ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধে উক্ত জায়গাটি ডিসি-খাগড়াছড়ি, টিএনও-দীঘিনালা, স্থানীয় হেডম্যান-চেয়ারম্যান মিলে পরিদর্শন করতে যায়। তৎসময়ে উক্ত স্থানে বিজিবি ক্যাম্প স্থাপনের বিরুদ্ধে এলাকাবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানায় ও ক্ষোভ প্রকাশ করে।

অথচ ১৯৯৯ সাল থেকে বিভিন্ন সময়ে দীঘিনালা মৌজার হেডম্যান প্রান্তর চাকমা দুই গ্রামের ৫৮ পরিবার প্রজাদের প্রত্যেকের নামে মোট ০.৩০ একর করে বন্দোবস্তী প্রদানের জন্য সহকারী কমিশনার, দীঘিনালা ও খাগড়াছড়িতে সুপারিশ প্রেরণ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার উক্ত স্থানে বিজিবি ব্যাটালিয়ন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী নামে পরিচিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী চক্র গ্রামে গ্রামে জুম্ম জনগণের প্রবল প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে। ফলে সন্ত্রাসীরা তাদের আধিপত্য ও অপকর্ম অব্যাহত রাখার হীনস্বার্থে সাধারণ মানুষের উপর বেপরোয়া চাঁদাবাজি, অপহরণ, জিম্মি, মুক্তিপণ আদায়, হত্যা-গুম ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে মে ২০১৩ হতে অক্টোবর ২০১৩ সময়ের মধ্যে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিবরণ দেয়া হল-

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে ২ নিরীহ গ্রামবাসীর নিহত

গত ১ মে ২০১৩ রাত ৮:৩০ টায় খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সদরে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের এলোপাতাড়ি গুলিতে ২ নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হয়। নিহত দুই গ্রামবাসীর পরিচয় হল- শুকনাছড়ি গ্রামের মনাইয়া চাকমা (২০) পিতা শুক্র কুমার চাকমা ও জুর্গাছড়ি গ্রামের শান্তিময় চাকমা (২০) পিতা-আনন্দ চাকমা।

জানা যায়, সমীর কান্তি চাকমার নেতৃত্বে দু'টি মোটর সাইকেল যোগে ৪ জন ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী লক্ষ্মীছড়ি উপজেলা সদরের জুর্গাছড়ি সদর থানা সংলগ্ন একটি মোটরসাইকেল গ্যারেজে এসে উক্ত ২ গ্রামবাসীকে লক্ষ্য করে ব্রাশফায়ার করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মনাইয়া চাকমা নিহত হয়। অপরদিকে গুরুতর আহত লক্ষ্মীছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র শান্তিময় চাকমাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হলে ডাক্তার তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।

দীঘিনালা উপজেলা থেকে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ৬ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৩ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ৯:৩০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের ডানে আটারকছড়া ও বগাপাড়া থেকে ছয়জন নিরীহ গ্রামবাসীকে আপন চাকমা ও রাসেল চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীর ১০/১২ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অপহরণ করে বলে জানা গেছে। তবে কী কারণে তাদের অপহরণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। অপহৃতরা হল-দীঘিনালা উপজেলার (১) কিনারাম চাকমা (৫৫) পিতা-নবীন কুমার চাকমা, গ্রাম-ডানে আটারকছড়া, (২) অনিল বিকাশ চাকমা (৩৮) পিতা-জরীপ ধন চাকমা, গ্রাম-আটারকছড়া, (৩) ভদ্রসেন চাকমা (৫২) পিতা-রমনী মোহন চাকমা, গ্রাম আটারকছড়া, (৪) অরুন জ্যোতি চাকমা (৩৭) পিতা-আশাপূর্ণ চাকমা, গ্রাম-বগাপাড়া, (৫) সুমতি চাকমা (৪৮) পিতা-দিন মোহন চাকমা, গ্রাম-জুরপানিছড়া, (৬) অমর বিকাশ চাকমা (২৫) পিতা-জন কার্বারী, গ্রাম-জুরপানিছড়া। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা অপহৃতদের ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের বেদম প্রহারের শিকার ৪ নিরীহ গ্রামবাসী

গত ২৪ মে ২০১৩ দুপুর ১২:০০ টায় ইউপিডিএফ-এর সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বামাগুমতি মৌজার সর্বসিদ্দি পাড়ার ককসা ত্রিপুরার বাড়িতে ডেকে এনে ৪ নিরীহ গ্রামবাসীকে বেদম মারধর করে গুরুতর আহত করে। এই গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-তারা জনসংহতি সমিতির কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করে। প্রহারের শিকার গ্রামবাসীরা হল- (১) বিশ্বরাম ত্রিপুরা কার্বারী (৫০) পিতা-মৃত সর্বসিদ্দি ত্রিপুরা, গ্রাম-সর্বসিদ্দি পাড়া; (২) চন্দ্র হংস ত্রিপুরা (৪৫) পিতা-মইনশর ত্রিপুরা, গ্রাম-কুকিছড়া; (৩) কুসুমবিতি ত্রিপুরা (৪০) স্বামী-মৃত বামপ্রসা ত্রিপুরা, গ্রাম-কেওয়া পাড়া ও (৪) বারু কুমার ত্রিপুরা (৪৫) পিতা-মৃত তিনশ কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম-শৈল্য কুমার কার্বারী পাড়া।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ২ নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৫ মে ২০১৩ রাত আনুমানিক ৩:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ইউপিডিএফের চন্দন চাকমা ও সংস্কারপন্থীর হোক্রে চাকমা (বিশাল)-এর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী দু'জন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে। অপহৃত ২ গ্রামবাসী হলেন-১) মিটিং কুমার ত্রিপুরা (৪৫) পিতা- যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গ্রাম-মনিরুজ্জামান মাস্টারপাড়া, বান্দরছড়া মৌজা, মাটিরাঙ্গা উপজেলা ও (২) তীর্থ রঞ্জন ত্রিপুরা (২৮) পিতা-রঞ্জিত কুমার ত্রিপুরা, গ্রাম-কলিঙ্গ কাবরি পাড়া (কেওয়া পাড়া), ১৯০ নং বান্দরছড়া মৌজা, মাটিরাঙ্গা উপজেলা। ঘটনার সময় সন্ত্রাসীরা তরুণী কুমার পাড়ার নন্দের বাঁশী ত্রিপুরা (৬০) পিতা-তরুণী কুমার ত্রিপুরার বাড়িটি ভাঙচুর করে দিয়ে যায়। বেদম মারধরের পর প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০,০০০ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে সন্ত্রাসীরা ২৬ মে তাদেরকে ছেড়ে দেয়।

লক্ষ্মীছড়ি'র দুল্যাতলীতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গৃহবধূ প্রহৃত

গত ২ জুন ২০১৩ খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার দুল্যাতলী ইউনিয়নস্থ দুল্যাতলী বাজার পাড়ার স্বপ্না ত্রিপুরা (২৭) স্বামী-শুক মারমাকে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা অমানবিকভাবে মারধর করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে যায় বলে জানা যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ দিন রাত আনুমানিক ২:৩০ টায় সুচেন্দ্র চাকমা (৩২) এর নেতৃত্বে আনুমানিক ১৫ জনের একদল ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী উপরোক্ত দুল্যাতলী বাজার পাড়ায় এসে শুক্র মারমার বাড়ি ঘেরাও করে। পরে বাড়ির লোকদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে শুক্র মারমা ও স্বপ্না ত্রিপুরাকে মারপিট করে গুরুতর আহত অবস্থায় ফেলে যায়। এদিকে এলাকাটা দুর্গম হওয়ার কারণে আহত স্বপ্না ত্রিপুরা হাসপাতালে যেতে পারেনি বলে জানা গেছে।

লংগদুতে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক ২ নিরীহ ছাত্র প্রহৃত, ৪ বাড়ি তল্লাশী

গত ৩ জুন ২০১৩ রাত আনুমানিক ১:৩০ টায় ইউপিডিএফের তপন জ্যোতি চাকমা ওরফে বর্মা ও সংস্কারপন্থীর আপন চাকমার নেতৃত্বে ২৫/২৮ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলা সদরের কাঁঠালতলা এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়িঘর ঘেরাও করে তল্লাসী চালায়। এ সময়ে সন্ত্রাসীরা চারটি বাড়িতে তল্লাশী চালায় এবং ভবতোষ চাকমা (৪২) পিতা-যামানী চাকমার দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে তার স্কুল পড়ুয়া দুই ছেলেকে বেদম মারধর করে। এছাড়া সন্ত্রাসীরা ভবতোষ চাকমার স্ত্রী সুমিতা চাকমা ও অপর গ্রামবাসী রিকো চাকমার মোবাইল সেট ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

ব্যাপক মারধরের শিকার ২ ছাত্র হল-১) অনুপ চাকমা (১৫) পিতা-ভবতোষ চাকমা, ১০ম শ্রেণীর ছাত্র, রাবেতা উচ্চ বিদ্যালয়, লংগদু, (২) তনয় চাকমা (১৩) পিতা-ঐ, ৭ম শ্রেণীর ছাত্র, ঐ স্কুল।

অপরদিকে সন্ত্রাসীদের তল্লাশীর শিকার ৪ ঘরবাড়ি হল-কাঁঠালতলা গ্রামের (১) ভবতোষ চাকমা (৪২) পিতা-যামানী চাকমা, (২) জ্ঞান জ্যোতি চাকমা, (৫৬) পিতা-নিরু চাকমা, প্রধান শিক্ষক, তবলছড়ি সরকারি প্রাইমারী স্কুল, (৩) স্মৃতি বিকাশ চাকমা (৩৭) পিতা-গুনসেন চাকমা, সহকারী শিক্ষক, বড় কাট্টলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (৪) রিকো চাকমা (৩০), পিতা-রমনী রঞ্জন চাকমা, গ্রাম-ঐ, কর্মচারী, ফ্যামিলি প্লানিং বিভাগ, লংগদু হাসপাতাল।

লক্ষীছড়ি থেকে ইউপিডিএফ কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ৬ জুন ২০১৩ রাত ১০:০০ টায় হৃজেন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে ৩০/৩৫ জনের একদল চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষীছড়ি উপজেলার সদর ইউনিয়নের ভোক্ক্যাছড়া নিবাসী লগ্যা চাকমা (৩০) পিতা-ফরাচান চাকমাকে অপহরণ করে।

জানা যায়, সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে গ্রামে এসে লগ্যা চাকমার বাড়ি ঘেরাও করে এবং বাড়ির দরজা খুলতে বলে। দরজা খুলে দিলে ঘরের ভিতরে ঢুকে লগ্যা চাকমা ও তার স্ত্রী উভয়কে এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে। পরে লগ্যা চাকমাকে বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে অপহরণ করে নিয়ে যায়। মারধরের ফলে লগ্যা চাকমার স্ত্রী মুক্তি চাকমা মারাত্মক আহত হয়।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক ৮ নিরীহ গ্রামবাসী প্রহৃত, একজনকে মৃত্যুর হুমকি

গত ১৩ জুন ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলাধীন বঙ্গলতলী ইউনিয়নের হাজাছড়া গ্রামে ইউপিডিএফ-যুব ফোরামের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক ৮ নিরীহ গ্রামবাসী ব্যাপক মারধরের শিকার হন এবং একজনকে গুলি করে হত্যার হুমকি ও অপর ১ জনকে অচিরেই তাদের সাথে দেখা করার নির্দেশ দেয়া হয়।

জানা যায়, ঐ দিন বিকাল প্রায় ৪:৩০ টায় বিমল কান্তি চাকমা (৪০) সিক্কাধন চাকমা ও অঙ্গদ চাকমা (৩৫)-র নেতৃত্বে ইউপিডিএফ-যুব ফোরাম সন্ত্রাসীদের একটি দল হাজাছড়া এলাকার সুনীল চন্দ্র চাকমার মুদির দোকানে আসে এবং আসা মাত্রই দোকানে বসে থাকা ৮ নিরীহ গ্রামবাসীকে উপর্যুপরি মারধর করতে থাকে। এই গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ-তারা ইউপিডিএফ-যুব ফোরাম কর্তৃক আয়োজিত বিগত ১২ জুন কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেয়নি।

প্রহৃত ৮ গ্রামবাসী হল-বঙ্গলতলী ইউনিয়নের গ্রামের (১) মরতস' চাকমা (৩৫) পীং-ফুলচন্দ্র চাকমা, (২) পরীক্কা চাকমা (৩৪), পীং- সাধন কুমার চাকমা, (৩) লাধাচুলো চাকমা (১৬) পীং- অঙ্গদ চাকমা, (৪) দলাকান' চাকমা (১৯) পীং-সাধন কুমার চাকমা, (৫) মঙ্গল কুমার চাকমা (৪৫) পীং-নীরোদ মোহন চাকমা, (৬) মাণিক চন্দ্র চাকমা (৪৬) পীং-অজ্ঞাত, (৭) জ্ঞানরন চাকমা (৪৬) পীং-বীর কুমার চাকমা ও (৮) কুজিবো চাকমা (৪৩) পীং- রাজ্যহরণ চাকমা।

অপরদিকে সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয় যে, খোকন চাকমা পীং-বুজো চাকমাকে যেখানে পাওয়া যায় সেখানে গুলি করে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এছাড়া মুদির দোকানের মালিক সুনীল কান্তি চাকমাকে নির্দেশ দেয় যে, অচিরেই তাদের সাথে দেখা করতে। তবে সুনীল কান্তি চাকমা এ সময় দোকানে উপস্থিত ছিলেন না।

লংগদুতে ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থীদের গুলিতে জনসংহতি সমিতির নিরস্ত্র প্রত্যাগত সদস্য খুন

গত ১৫ জুন ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৮:০০ টায় সংস্কারপন্থী দলের আপন চাকমা ও ইউপিডিএফ এর তপন জ্যোতি চাকমা বর্মার নেতৃত্বে সেনা পোশাক পরিহিত ১৫-২০ সদস্য বিশিষ্ট সশস্ত্র একটি সন্ত্রাসী দল হামলা চালিয়ে রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলা সদরের টিনটিল্যা এলাকাস্থ কাট্টলতলা নামক স্থানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির প্রত্যাগত সদস্য করুণ চাকমা (৪৩) পিতা-অনিল চাকমা, গ্রাম-টিনটিল্যাকে গুলি করে হত্যা করে। উল্লেখ্য, করুণ চাকমা দীর্ঘ দিন ধরে কোন সাংগঠনিক দায়িত্ব না নিয়েই লংগদু পূর্বকূল এলাকায় তার স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন এবং অনেক দিন পর ঐ দিন ১৫ জুন ২০১৩ পরিবার নিয়ে টিনটিল্যার বাবার বাড়ি বেড়াতে আসেন। ঐ দিনই সকালে তার বাবার বাড়ির পার্শ্ববর্তী উক্ত কাত্তলতলা নামক স্থানে ফেল্যা মেম্বারের দোকানে বসে থাকা অবস্থায়ই উক্ত সন্ত্রাসীরা হঠাৎ হানা দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু ঘটে।

মাটিরাঙ্গা থেকে ফেরার পথে ইউপিডিএফ কর্তৃক দুই আওয়ামীলীগ কর্মী অপহৃত

গত ১৬ জুন ২০১৩ খাগড়াছড়ি'র মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদর থেকে ফেরার পথে গুইমারা আওয়ামীলীগ সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ও তার গাড়ী চালককে ইউপিডিএফের হ্লাচাথোয়াই মারমা (অমর মাষ্টার) ও অমর জ্যোতি চাকমা (শ্রাবণ) এর নেতৃত্বে ১০/১২ জনের একদল চিহ্নিত সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাইল্যাছড়ি

নামক স্থান থেকে বিকাল আনুমানিক ২.৩০ টার সময় অপহরণ করে। অপহৃত পরিবারের কাছে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা প্রথমে এক কোটি টাকা পরে পঞ্চাশ হাজার টাকা মুক্তিপণ হিসেবে দাবি করে। পরে মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফের হাতে এক কার্বারী প্রহৃত

গত ১৬ জুন ২০১৩ বেলা আনুমানিক ২.০০ টায় চন্দন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বান্দরছড়া মৌজার তাকার মনি কার্বারী পাড়ায় হানা দিয়ে গ্রামের কার্বারী কুংছা ত্রিপুরাকে বেদম মারধর করে গুরুতরভাবে আহত করে। এমনকি মারধরের ঘটনাটা প্রচার করা হলে আরও ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে কার্বারীকে হুমকি দিয়ে যায়।

জানা গেছে, কুংছা ত্রিপুরা গ্রাম থেকে ইউপিডিএফ এর নির্ধারিত চাঁদা আদায় করে দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এই মারধর করা হয়। অপরদিকে এই সন্ত্রাসীরা পরের দিন ১৭ জুন ২০১৩ রাত আনুমানিক ১.০০ টার সময় একই মৌজার স্থায়ী বসতি বাঙালি পাড়ার আবুল কালামের চায়ের দোকান আগুনে পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

মাটিরাঙ্গায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের অপপ্রচারে ৫ গ্রামের ৩৯ পরিবার ঘরছাড়া

গত ১৯ জুন ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১১ টায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি ও খেদাছড়া এলাকাবাসীদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী জনলাল ত্রিপুরা ও নতুন কুমার ত্রিপুরা মোবাইল ফোনে ০১৫৫৩৭৫১৫১৪ ও ০১৫৫৪৭৭৬৬৬৮ নম্বর থেকে কল করে জানায় যে, রাতে গুমতি এলাকায় সেটেলার বাঙালিদের উপর হামলা চালানো হবে। তাই সময় থাকতে নিজ নিজ বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে পরামর্শ দেয়। সে অনুযায়ী বান্দরছড়া মৌজার তরুনী পাড়া থেকে ১০ পরিবার, তাকার মনি পাড়ার ১৫ পরিবার, গুমতি পাড়া থেকে ১ পরিবার, চৌংড়া কাপা মৌজা ৮ পরিবার, পূর্ব খেদাছড়ার ৫ পরিবার ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এতে নিরীহ গ্রামবাসীরা চরম ভোগান্তি ও হয়রানির শিকার হয়। অপরদিকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা রাত আনুমানিক ১১ টার দিকে গুমতি এলাকার সেটেলার বাঙালিদেরকে মোবাইলে জানায় যে, তাদের উপর কোন প্রকার হামলা বা ক্ষতি করা হবে না। ইউপিডিএফ শুধু জনসংহতি সমিতির সদস্যদের খুঁজতে টহল বাড়াবে বলে বাঙালিদের জানায়।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে দুর্বিষহ অবস্থা কাটানোর পর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী মুরুব্বীদের মধ্যস্থতায় গ্রামবাসীদের স্ব স্ব গ্রামে ফিরতে অনুমতি দেয় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা।

মাটিরাঙ্গার গুমতি বাজারে যাওয়ার অপরাধে ৩ গ্রামবাসীর উপর ইউপিডিএফের শারীরিক নির্যাতন

গত ২৩ জুন ২০১৩ খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার বান্দরছড়া মৌজার ৩ গ্রামবাসী স্থানীয় গুমতি বাজারে যাওয়ার অপরাধে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। নির্যাতনের শিকার ৩ গ্রামবাসী হল- উদয় কুমার পাড়ার (১) বিশ্বধন ত্রিপুরা (৫৫) পীং-মৃত মায়াধন ত্রিপুরা, (২) হিয়াছা ত্রিপুরা (৩৫) পীং ধনী মোহন ত্রিপুরা ও (৩) মিসেস কুসুমলতা ত্রিপুরা (২৮) স্বামী-হিয়াছা ত্রিপুরা।

জানা যায়, ঐ দিন দুপুর ১২:০০ টায় দেবদত্ত ত্রিপুরার নেতৃত্বে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট ইউপিডিএফ-এর একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বান্দরছড়া মৌজার উদয় কুমার পাড়ার বিশ্বধন ত্রিপুরা (৫৫) পিতা-মৃত মায়াধন ত্রিপুরাকে ধরে কলিঙ্গ মোহন কার্বারীপাড়ায় ইউপিডিএফের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করে মারাত্মক আহত অবস্থায় ছেড়ে দেয়। অপরদিকে সেদিন সন্ত্রাসীরা বিকাল ৩:০০ টায় একই পাড়ায় হানা দিয়ে হিয়াছা ত্রিপুরা (৩৫) পিতা-ধনী মোহন ত্রিপুরা এবং তার স্ত্রী কুসুমলতা ত্রিপুরা (২৮)কে নিজ বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরে সর্বসিদ্দিপাড়ায় নিয়ে গিয়ে সারারাত তাদের মারধর করে পরদিন মারাত্মক আহত অবস্থায় ছেড়ে দেয় বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক গ্রামবাসীদেরকে হুমকি এবং ৩ বাঙালিকে প্রহার

গত ২৫ জুন ২০১৩ বিকাল ৩:০০ টায় চন্দন চাকমার নেতৃত্বে ১১ জনের ইউপিডিএফের একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসীদল খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার বান্দরছড়া মৌজার উদয় কুমার কাবরী পাড়ার জুম্ম অধিবাসীদের জানিয়ে দেয় যে, তারা যেন সেদিন বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে এলাকা ছেড়ে নিরাপদে চলে যায়। তা না হলে পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। অপরদিকে, সন্ত্রাসীরা চলে যাওয়ার পথে কাজ থেকে ফিরে আসা তিনজন সেটেলার বাঙালিকে পথে পেয়ে তাদেরকে আটকে বেদম মারধর করে মারাত্মক আহতাবস্থায় ফেলে যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের নির্যাতন ও হুমকির শিকার ২ নারী

গত ৪ জুলাই ২০১৩ পার্বত্য চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী জনলাল ত্রিপুরার নেতৃত্বে ৮ জনের সশস্ত্র একটি দল খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার বান্দরছড়া মৌজার তরুণী পাড়ায় পিতা-পুত্র দুই জুম্ম পরিবারের উপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় সন্ত্রাসীদের মারধরে ২ নারী আহত হয়। আহত দুই জুম্ম নারী হল-পিলুকতি ত্রিপুরা (২৯) স্বামী-মঙ্গল কুমার ত্রিপুরা ও এলি ত্রিপুরা (২২) পিতা-নন্দের বাঁশি ত্রিপুরা।

জানা যায়, ঐ দিন রাত আনুমানিক ১২:০০টায় সন্ত্রাসীরা ছাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে নন্দের বাঁশি ত্রিপুরা (৬৫) পিতা-মৃত তরুনী কুমার ত্রিপুরা ও তার ছেলে মঙ্গল কুমার ত্রিপুরা (৪০)-এর গুদাম ঘরে ঢুকে পড়ে। কিন্তু এ সময় তাদেরকে বাড়িতে না পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের পরিবারের উক্ত ২ নারীকে টেনে-হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে নির্বিচারে মারধর করে। এ সময় সন্ত্রাসীরা গৃহকর্তাদের বাড়িতে না পেয়ে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পরে তারা বৃদ্ধ নন্দের বাঁশি ত্রিপুরা ও ছেলে মঙ্গল কুমার ত্রিপুরাকে গুলি করে হত্যা এবং ঘরে আগুন দেওয়ার হুমকিসহ নানা ভয়ভীতি দেখায়। সন্ত্রাসীরা প্রায় দুই/তিন ঘন্টা বাড়ির জিনিসপত্র তছনছসহ তান্ডব চালিয়ে চলে যায়। উল্লেখ্য

যে, ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের অব্যাহত অহেতুক নজরদারি, হয়রানিসহ নানা হুমকির কারণে উক্ত দুই পরিবারের দুই গৃহকর্তা প্রায় দুইমাস ধরে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়।

মানিকছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক এক চুক্তি সমর্থককে গুলি করে হত্যা

গত ৫ জুলাই ২০১৩ দুপুর প্রায় ১:০০টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী ইউনিয়নের ভোলাছড়া (মংচিনু হেডম্যান পাড়া) গ্রামে আবদুল শাহ আলমের চায়ের দোকানে উমং মারমা (৫৫) নামের এক নিরীহ গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে।

জানা যায়, ঘটনার সময় উমং মারমা দোকানে চা খাচ্ছিল। এ সময়ে ইউপিডিএফের ২ জন চিহ্নিত সন্ত্রাসী কালা মারমা (২৫), পিতা-রিপ্রু মারমা, গ্রাম-মংপ্রুতলী হেডম্যান পাড়া, তিনটহরী ইউনিয়ন ও মনু মারমা (৩০) পিতা- থুইমং মারমা, সাং-ঐ সেখানে এসে তাকে গুলি করে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহত উমং মারমা মানিকছড়ি উপজেলার তিনটহরী ইউনিয়নের কুমারীপাড়ার চিনু মারমার ছেলে।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক সাবেক এক মেম্বার প্রহৃত

গত ৬ জুলাই ২০১৩ রোজ শনিবার সকাল আনুমানিক ১২:০০টায় জীবন চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার মাকুমতৈছা মৌজার গুমতি ইউনিয়নের গোকুলমনি পাড়ার সাবেক ইউপি মেম্বার অভি রঞ্জন ত্রিপুরা ওরফে অতুল (৪০) পিতা-মৃত রামধন ত্রিপুরাকে ধরে সর্বসিদ্ধি পাড়ায় নিয়ে গিয়ে বেদম মারধর করে মারাত্মক আহত করে।

জানা যায়, নির্যাতিত ওই ব্যক্তি স্থানীয় গোমতি বাজারে গিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা-কাটা করেছিল। এ অভিযোগে তাকে মারধর করা হয়। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ইতোমধ্যে গুমতি বাজার বয়কটের ডাক দিয়েছিল।

ইউপিডিএফ কর্তৃক পানছড়ি বাজার থেকে এক গ্রামবাসীকে অপহরণ

গত ৭ জুলাই ২০১৩ খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি বাজার থেকে ইউপিডিএফের বিব্ব চাকমার নেতৃত্বে কয়েকজন সশস্ত্র সন্ত্রাসী লোগাং ইউনিয়নের কিষ্টমনি কার্বারী পাড়ার বাসিন্দা কল্প মোহন ত্রিপুরা (২৭) পিতা-কিষ্টমনি কারবারীকে (ত্রিপুরা) দিন দুপুরে অপহরণ করে নিয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, সেদিন পানছড়ি বাজারের হাটবার ছিল। অপহৃতকে মুক্তি দেয়ার জন্য এলাকাবাসী অপহরণকারীদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানায় যে এ বিষয়ে ইউপিডিএফের হাই কম্যান্ডের সাথে পরামর্শ করে মুক্তি দেয়া হবে। কিন্তু পরে স্থানীয় ইউপিডিএফ নেতারা অপহরণের বিষয়টি অস্বীকার করে।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ কর্তৃক টেলিটকের পাঁচ কর্মকর্তা অপহরণ

মুক্তিপণ ও নাটকীয়তার ১৭ দিন পর অবশেষে মুক্তি

গত ৮ জুলাই ২০১৩ আনুমানিক বিকাল ৩:০০ টায় রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার মারিশ্যা-বারিবিন্দুঘাট এলাকা থেকে রাষ্ট্রায়ত্ত মুঠোফোন কোম্পানি টেলিটকের সহায়ক প্রতিষ্ঠান বি-টেকনোলজির ৫ কর্মকর্তাকে পার্বত্য চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা অপহরণ করে।

জানা যায়, ঘটনার সময় অপহৃতরা টাওয়ার মেরামতের জন্য মারিশ্যা-বারবিন্দুঘাট এলাকায় গেলে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা বি-টেকনোলজির প্রকৌশলী মোঃ আক্তার হোসেন, টেকনিশিয়ান মোঃ হেমায়াত, মোঃ ইমরুল হোসেন, সুপারভাইজার সুজা উদ্দিন ও মোঃ মুজিবুর রহমানকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণকারীরা প্রথমে ৪০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। পরে গত ১১ জুলাই ২০১৩ খাগড়াছড়ি'র গিরিফুল এলাকায় অপহরণকারীদের সাথে বি-টেকনোলজির প্রতিনিধিদের এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অপহরণকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পাঁচ কর্মকর্তার মুক্তিপণ হিসেবে তিন কোটি টাকা দাবি করলে এতে মতৈক্য না হওয়ায় কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক ভেস্তে যায়। অপহরণের ১৭ দিন পর গত ২৬ জুলাই ২০১৩ শুক্রবার রাত ২:০০টার দিকে খাগড়াছড়ি'র দীঘিনালা উপজেলার মেরুং এলাকা থেকে রহস্যজনক নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে অবশেষে অপহৃতরা মুক্তি পায়। অপহৃতরা মুক্তি পেলেও অপহরণের সাথে কারা জড়িত ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী বা প্রশাসন বরাবরের মতো এ ঘটনায়ও আনুষ্ঠানিকভাবে ইউপিডিএফকে দায়ী না করে অপহরণ ঘটনাকে আড়াল করার চেষ্টা করে। বরং প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা গোপনে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের সাথে আঁতাত করে চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের অপহরণ বাণিজ্যকে উৎসাহিত করে চলেছে।

মাটিরাঙ্গায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৪ গ্রামবাসী নির্যাতিত

অর্থদন্ড ও মুছলেকা আদায়ের পর মুক্তি

গত ১৩ জুলাই ২০১৩ চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি ইউনিয়নের ৪ নিরীহ গ্রামবাসীকে খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ে আটকে রেখে তাদের উপর মধ্যযুগীয় কায়দায় শারীরিক নির্যাতন চালায়। ঐ দিন সন্ধ্যায় ব্যাপক নির্যাতনের পর ৩০ হাজার টাকা অর্থদন্ড ও মুছলেকা নিয়ে ঐ ৪ গ্রামবাসীকে মুক্তি দেয়া হয়। চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক নির্যাতিত ৪ নিরীহ গ্রামবাসী হল-১) মুখ্য রঞ্জন ত্রিপুরা(৩৮), পিতা-মৃত যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা, গ্রাম- বেহাদন্ত কার্বারী পাড়া, (২) রোহিনী কুমার ত্রিপুরা (৫৫), পিতা-মৃত দুনিন্দ্র ত্রিপুরা, গ্রাম-শারাদা কুমার কার্বারী পাড়া, (৩) বাক্সা রাম ত্রিপুরা (৪২), পিতা-বোবা ত্রিপুরা, গ্রাম শারাদা কুমার কার্বারী পাড়া এবং (৪) অভি রঞ্জন ত্রিপুরা অতুল (৪০) পিতা-মৃত রামধন ত্রিপুরা, গ্রাম-গকুল মনি পাড়া।

জানা যায়, ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে খাগড়াছড়ি'র স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য বান্দরছড়া মৌজা ও মাকুম তৈইছা মৌজার উক্ত ৪ গ্রামবাসীকে খবর পাঠানো হয়। ঘটনার দিন ঐ ৪ গ্রামবাসী ইউপিডিএফ কার্যালয়ে উপস্থিত হলে ইউপিডিএফের শীর্ষ সন্ত্রাসী দেবদত্ত ত্রিপুরা (৪০), মাটিরাঙ্গা উপজেলা ইউনিট প্রধান চন্দন চাকমা, যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য ও চাঁদা কালেক্টর জিকো ত্রিপুরা গংরা তাদের একটি গোপন কক্ষে সারাদিন আটকে রেখে মধ্যযুগীয় কায়দায় শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে মারাত্মক আহত করে। পরে সন্ধ্যায় সন্ত্রাসীরা এই ৪ জনকে ৩০ হাজার টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেয়।

পানছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ব্যক্তি খুন

গত ১৩ জুলাই ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০:০০ টায় বিব্ব চাকমার নেতৃত্বে ইউপিডিএফের একদল সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি উপজেলার পানছড়ি ইউনিয়স্থ তাপিদা কার্বারী পাড়া নিবাসী অরুন কান্তি চাকমা, পিতা-শুভধন চাকমাকে গুলি করে হত্যা করে। জানা গেছে, সন্ত্রাসীরা পথ দেখিয়ে দেয়ার অজুহাত দেখিয়ে তাকে বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়ে কিছুদুর এগিয়ে যাওয়ার পর পথিমধ্যে গুলি করে হত্যা করে চলে যায়। অরুন কান্তি চাকমা প্রত্যাগত জেএসএস সদস্য সমর চাকমার ছোট ভাই। তাছাড়া তিনি একজন খ্রিস্টানধর্মের স্থানীয় ধর্মপ্রচারক। স্থানীয় সূত্রমতে, বিশেষতঃ খ্রিস্টানধর্মীয় প্রচারক বলেই তাকে এভাবে গুলি করে হত্যা করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ যে, বিগত ২০০৬ সালে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পানছড়ির তারাবনছড়াতে নির্মিত গির্জাটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

রাঙামাটিতে সংস্কারপন্থী-ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক যুব সমিতির সদস্য গুলিবিদ্ধ

গত ১৭ জুলাই ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮:৩০ টায় রাঙামাটি জেলা শহরের রানীদয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে রাঙামাটি-চট্টগ্রাম প্রধান সড়কে সংস্কারপন্থী-ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাঙামাটি জেলা কমিটির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক পাপুল বিকাশ চাকমা (৩০) গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে জখম হন। ডান কাঁধের পেছন দিকে গুলিবিদ্ধ পাপুল বিকাশকে পথচারীরা তাৎক্ষণিকভাবে রাঙ্গামাটি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর ডাক্তারদের পরামর্শক্রমে তাকে দ্রুত আবার চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অপারেশন ও বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর পাপুল বিকাশ সেরে উঠেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ঐ সময় পাপুল বিকাশ চাকমা একা মোটর সাইকেল যোগে নিউমার্কেটের দিক থেকে কল্যাণপুরের দিকে আসছিলেন। রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের কাছে এসে পৌছলে সেখানে থাকা স্পিড ব্রেকারে মোটর সাইকেলে গতি কমিয়ে দেন। আর তখনি পেছন দিক থেকে তাকে অনুসরণ করা সন্ত্রাসীরা পাপুলকে লক্ষ্য করে গুলি করে। ডান কাঁধের পেছনে গুলি লেগে পাপুল তাৎক্ষণিকভাবে মোটর সাইকেলটি ফেলে রেলে বসে পড়েন এবং একটু দূরে গিয়ে পেছন ফিরে তাকানো দুই সন্ত্রাসীকেও দেখতে পান। পাপুল বিকাশ বন্ধুদের ফোন করতে চেষ্টা করেন। পথচারীরা তাৎক্ষণিকভাবে এগিয়ে এলে সন্ত্রাসী দ্রুত পালিয়ে যায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি নাইন এম এম পিস্তলের গুলির খোসা উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে। জানা গেছে, সন্ত্রাসীদের মধ্যে একজন সংস্কারপন্থী-ইউপিডিএফ-এর ভাড়াটে তথাকথিত কিলার গ্রুপের সদস্য।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক এক হেডম্যান নির্যাতনের শিকার

গত ২২ জুলাই ২০১৩ নয়ন চন্দ্র চাকমার নেতৃত্বে একদল সংস্কারপন্থী সশস্ত্র সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার আটারকছড়া ইউনিয়নের ইয়ারেংছড়ি মৌজার হেডম্যান ভাঙ্গামুড়া গ্রামের বাসিন্দা নিখিল প্রিয় চাকমা, পিতা- সাধন কুমার কার্বরিকে তাদের গোপন আস্তানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে। পরে ২০ হাজার টাকার বিনিময়ে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

জানা যায়, সংস্কারপন্থী দলের সশস্ত্র সন্ত্রাসী নয়ন চন্দ্র চাকমা মোবাইল ফোনে গত ১৯ জুলাই ২০১৩ হেডম্যান নিখিল প্রিয় চাকমার স্ত্রীকে তাদের সশস্ত্র গ্রুপের লোকদের জন্য দুপুরের ভাত ও তরকারী রান্না করে তাদের গোপন আস্তানায় পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ যথাযথভাবে পালন না করায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এ নির্যাতন করে বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গায় ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

জেরে সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম গ্রামে হামলা

গত ৩১ জুলাই ২০১৩ রাত আনুমানিক ১:০০ টায় খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১ নং তাইন্দং ইউনিয়নের নোয়াপাড়ায় অবৈধ বসতিস্থাপনকারী সেটেলারদের গ্রামে ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থীদের ১০-১২ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী তাইন্দং ইউপি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলামকে অপহরণের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে টহলরত একদল সেটেলার বাঙালিদের মুখোমুখি হয়। এসময় ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা ৫/৬ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে সরে পড়ে। এ ঘটনার ১০-১৫ মিনিট পর তাইন্দংয়ের প্রতিটি মসজিদ ও মাদ্রাসা থেকে সেটেলার বাঙালিরা তাদের উপর হামলা হয়েছে বলে মাইকে ঘোষণা করে সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধে এগিয়ে আসার আহবান জানায়। এতে সেটেলার বাঙালিরা উত্তেজিত হয়ে তাইন্দং বাজারে জড়ো হয়।

এদিকে, এ ঘটনার খবর জুম্মদের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে সেটেলার বাঙালিদের হামলার ভয়ে পার্শ্ববর্তী বগাপাড়া, হেডম্যানপাড়া, তংগ্য মহাজন পাড়া, সর্বেশ্বর কাবরী পাড়া, রামবাবু ঢেবা পাড়া ও পোড়াবাড়ী পাড়ার সাধারণ লোকজন নিজ ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেতে থাকে।

জানা যায়, ইউপিডিএফ ও সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা দীর্ঘদিন থেকে তাইন্দং ইউপি চেয়ারম্যান তাজুল ইসলামের কাছ থেকে

পাঁচ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল। কিন্তু চাঁদা না পাওয়ায় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালায় বলে জানা যায়।

নানিয়ারচরে নৌপথে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক চাকুরীজীবীদের বোট আটক ও তল্লাশী

গত ৫ আগস্ট ২০১৩ সকাল আনুমানিক ৯:১৫ টায় ইউপিডিএফের সশস্ত্র একটি দল রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের কমতলি এলাকায় বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তরের চাকুরীজীবীদের আটক করে এবং যাত্রীদের নিকট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের কোন প্রচারপত্র আছে কিনা তল্লাশী চালায়। তল্লাশীর সময়, বেসরকারী সংস্থা গ্রীনহিল এর তিনটি বুকলেট ছাড়া তারা কিছুই খুঁজে পায়নি। তবে বোটের যাত্রীরা অহেতুক হয়রানির শিকার হয়।

ইউপিডিএফের চাঁদা দাবি ও হয়রানির মুখে খাগড়াছড়িতে ঔষুধ সরবরাহ বন্ধ

ইউপিডিএফের অব্যাহত হয়রানি ও মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবীর মুখে গত ১৪ আগস্ট ২০১৩ থেকে জেলার আটটি উপজেলায় ঔষধ কোম্পানীগুলো তাদের ঔষধ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে ঔষুধ সরবরাহ বন্ধ থাকায় জেলার সর্বত্র ঔষধের চরম সংকট দেখা দেয়। এতে করে অসুস্থ রোগীর স্বজনরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয় এবং ভুক্তভোগীরা ইউপিডিএফের এধরণের কার্যকলাপকে কান্ডজ্ঞানহীন, অমানবিক ও সন্ত্রাসীর কাজ বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে।

জানা যায়, গত ২৯ জুলাই ২০১৩ রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কের ১৮ মাইল নামক এলাকায় ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী বেক্সিমকো ও রেনেটা ঔষধ কোম্পানীর দু'টি গাড়ি আটকে চালককে মারপিট ও তিন লাখ টাকার ঔষধ লুট করে নিয়ে যায়।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক ৩ ব্যক্তি অপহৃত

গত ১৯ আগস্ট ২০১৩ রাতে রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের হাজাছড়ির পশ্চিমপাড়া থেকে বীর কুমার চাকমা (৪৫) পিতা-মৃত চন্দ্র লাল চাকমাকে তার নিজ বাড়ি থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক অপহৃত হয়।

জানা যায়, নানিয়ারচর উপজেলার বুড়িঘাট ইউনিয়নের উত্তর হাতিমারা গ্রামের রজনী চাকমার ছেলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কানুঙ্গো চাকমা ওরফে পরিত্রাণ এর নেতৃত্বে এ অপহরণের ঘটনা ঘটানো হয়।

অপরদিকে গত ২০ আগস্ট ২০১৩ ইউপিডিএফের ঐ সন্ত্রাসীরা একই উপজেলাধীন ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের লাঙেলপাড়ার রাম প্রসাদ চাকমা (৩৫) পিতা-মৃত অরুন চন্দ্র চাকমাকে দুপুরে ও হাজাছড়ি পশ্চিম পাড়া থেকে কালোমনি চাকমা (২৫) পিতা-সাধন কুমার চাকমাকে রাতে নিজ বাড়ি থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহৃতদের বিরুদ্ধে অপহরণকারী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের অভিযোগ হল-তারা ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও গালমন্দ করতেন। এলাকাবাসীদের ধারণা এ কারণেই তাদের অপহরণ করা হয়েছে। এলাকাবাসীর চাপের মুখে পরে সকলকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী নির্যাতিত

গত ২০ আগস্ট ২০১৩ মঙ্গলবার আনুমানিক সন্ধ্যা ৭:০০ টায় কানুঙ্গো চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের ৫ সন্ত্রাসী রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর উপজেলার কৃষ্ণমাছড়া গ্রামবাসী কালী মোহন চাকমা (৬০) পিতা-বড়মূখ্যা চাকমাকে মাইসছড়ি রাস্তা দেখিয়ে দেওয়ার অজুহাতে ধরে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর কোন কিছু জিজ্ঞাসা না করে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা কালী মোহন চাকমাকে এলোপাতাড়ি মারধর করে মারাত্মক আহত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। পরে গ্রামের লোকজন তাকে উদ্ধার করে নিজ বাড়িতে পৌছে দেয়।

কিছুক্ষণ পর আরও ৩ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী এসে প্রহৃতের ছেলে উদয়ন চাকমা (৩২) এর কাছ থেকে একটি মোবাইল সেট কেড়ে নিয়ে যায়। ঘটনার পর অপহরণ ও হত্যার ভয়ে উদয়ন চাকমা রাঙ্গামাটি শহরে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়।

শুভলং-এ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক ইউপি সদস্য অপহরণের পর খুন

গত ২৯ আগস্ট ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন বরকল উপজেলার শুভলং ইউনিয়নের রূপবান গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক বিমলেন্দু চাকমা (৪৫) পীং- সারেঙ্যা চাকমা নামের এক ইউপি সদস্য অপহৃত হয়। অপহরণের পরপরই খুন করা হয় বলে জানা যায়, তবে এখনও পর্যন্ত তার লাশ পাওয়া যায়নি। পরে জনগণের অব্যাহত চাপের ফলে পুলিশ অভিযুক্ত জ্যোতির্ময় চাকমাকে গ্রেফতার করে।

জানা যায়, ঐ দিন রাত ৯:৩০ টায় ইউপিডিএফের জ্যোতিময় চাকমা ও রূপায়ন চাকমার নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী শুভলং ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ডের সদস্য বিমলেন্দু চাকমাকে রূপবান গ্রামের তার বাসা থেকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

গত ৩১ আগস্ট ২০১৩ স্থানীয় ইউপি সদস্য মিসেস বনলতা চাকমা ও মধু মিলন চাকমার নেতৃত্বে প্রায় ৩০০ গ্রামবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে নিকটবর্তী হারিহাবা এলাকায় ইউপিডিএফের আস্তানায় গিয়ে ইউপিডিএফের সদস্যদের নিকট অপহরণ ঘটনার প্রতিবাদ জানান এবং অপহৃত বিমলেন্দু চাকমাকে জীবিত বা মৃত ফিরিয়ে দেয়ার দাবী জানান। এ সময় সেখানে উপস্থিত ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী দলের নেতা বিশাল চাকমা প্রথমে ঘটনার ব্যাপারটি এড়িয়ে যেতে চায়। তবে পরে বলে যে, অপহৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব নয় এবং তবে লাশ ফিরে পেতে সে সাহায্য করতে পারে।

উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা গত ২০১২ সালের আগস্ট মাসেও এই বিমলেন্দু চাকমাকে শুভলং ইউনিয়নে গৃহবন্দী

করে রেখেছিল। পরে ১৬ আগস্ট ২০১২ শুভলং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ছিলছড়ি-হাজাছড়া এলাকায় গেলে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা শুভলং ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সদস্য চন্দ্র কুমার চাকমাকেও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সমর্থক বলে আটকে রেখে অমানবিক শারীরিক নির্যাতন করে।

রাঙ্গামাটি শহরে আরও এক যুবককে লক্ষ্য করে গুলি

গত ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সন্ধ্যা ৭:১৫ টায় রাঙামাটি শহরের বনরূপা এলাকায় প্রমেশ চাকমা (৩০) নামের এক যুবককে গুলি করা হয়। তবে গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তার বাঁ কান ভেদ করে চলে যায়। প্রমেশ চাকমা কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত নয়, তাকে জনসংহতি সমিতির সদস্য মনে করে ইউপিডিএফ-সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জানা যায়, প্রমেশ চাকমাকে গুলি করার পর ঐ অস্ত্রধারী সেটেলার বাঙালি পিস্তল হাতে হ্যাপী মোড়ের দিকে দৌড়াতে শুরু করলে লোকজন ধাওয়া করে। পরে ঐ সন্ত্রাসী পিস্তলটি ফেলে চম্পকনগরের দিকে পালিয়ে যায়। পুলিশ উদ্ধারকৃত পিস্তলে তিন রাউন্ড তাজা গুলি এবং বনরূপার ঘটনাস্থলে একটি গুলির খোসা পায় বলে জানা যায়।

মাটিরাঙ্গায় এক গ্রামবাসীকে শর্ত সাপেক্ষে মৃত্যুদণ্ড থেকে মুক্তি দিয়েছে ইউপিডিএফ

গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সকাল আনুমানিক ১১.০০টায় ইউপিডিএফ সমর্থিত গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সন্ত্রাসী জিকো ত্রিপুরা (বর্তমানে আলুটিলায় চাঁদা সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত) খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার গুমতি ইউনিয়নস্থ বান্দরছড়া মৌজার নন্দের বাঁশী ত্রিপুরা, পিতা-মৃত তরুণী কুমার ত্রিপুরাকে খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ইউপিডিএফ কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য যে, নন্দের বাঁশী ত্রিপুরাকে ইতিপূর্বে একই কারণে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা ২৫,০০০ টাকা জরিমানা করে। কিন্তু তিনি সে পরিমাণ অর্থ দিতে অক্ষম ছিলেন। তাই চার মাসাধিক সময় তিনি ইউপিডিএফ এর ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তখন ইউপিডিএফ এর পক্ষ থেকে তার মৃত্যুদণ্ড জারি করা ছিল। কিন্তু পরে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

লংগদুতে সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক এক গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ

গত ১১ অক্টোবর ২০১৩ বিকাল প্রায় ৪.১০ ঘটিকার সময় আপন চাকমার নেতৃত্বে ৪ সদস্যের সংস্কারপন্থীর সশস্ত্র একটি দল রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলা সদরের কাঠালতলা বাজারে লংগদু দজর পাড়ার সোনাকাজি চাকমা (৪৮) পিতা-মৃত মুক্ত কিশোর চাকমাকে গুলি করে। এতে সোনাকাজি চাকমা মারাত্মকভাবে আহত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে তাকে প্রথমে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি আশঙ্কামুক্ত বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সোনাকাজি চাকমা তাঁর ব্যবসায়িক কারণে দীর্ঘদিন ধরে লংগদু সদরে অবস্থান করছেন। ঘটনার দিন তিনি উল্লেখিত সময়ে তাঁর বাসস্থান থেকে তরি-তরকারী বাজার করার উদ্দেশ্যে কাঠালতলা বাজারে যান। সেখানে বিকাল ঠিক ৪.১০ টার সময় মাছের দোকান থেকে মাছ কেনার মুহূর্তে হঠাৎ তাঁর পেছনে পিস্তল তাক করে একজন সন্ত্রাসী গুলি করে পালিয়ে যায়। তার বাম পাশের বাহুর সামান্য নিচে গুলিবিদ্ধ হলে তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্রচুর রক্তক্ষরণ দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীরা তাকে প্রথমে লংগদু উপজেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে আশংকাজনক অবস্থা দেখে সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ভর্তির পর কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বাঘাইছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক তিন নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ৪ অক্টোবর ২০১৩ রাত আনুমানিক ১০:৩০ টায় রাঙামাটি জেলাধীন বাঘাইছড়ি উপজেলার তুলাবান এলাকার নিজ বাড়ি থেকে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের কর্তৃক তিন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করা হয়। অপহৃতরা হলেন মৃত হিরণ কুমার চাকমার তিন ছেলে যথাক্রমে সুমন চাকমা (২৯), উদয়ন চাকমা (৩৬) ও লাল বরণ চাকমা (৪২)। স্থানীয় জনগণের চাপে অপহরণের দু'দিন পর গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ রাতে অপহৃতদের ছেড়ে দেয়া হয়।

মহালছড়িতে সংস্কারপন্থী কর্তৃক এক গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২০ অক্টোবর ২০১৩ দিবাগত রাতে আপন চাকমার নেতৃত্বে সংস্কারস্থীদের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন মহালছড়ি উপজেলার উল্টাছড়ির বিহারপাড়া নিবাসী নিহারবিন্দু চাকমা (৭০) পিতা মৃত দুর্গা মোহন চাকমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অপহরণের পর সত্তর বছরের বৃদ্ধ নিহারবিন্দু চাকমাকেও সন্ত্রাসীরা অমানবিকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। পরে ২২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে মুক্তি দেয় বলে জানা যায়।

জানা যায়, বেশ কয়েক বছর আগে আপন চাকমার পিতার নিকট হতে নিহার বিন্দু চাকমা একটা অনাবাদিত (জঙ্গলাকীর্ণ) জমি কিনে নেন। কেনার পর নিহার বিন্দু চাকমা তা আবাদ করে বর্তমানে ৪ কানি পরিমাণ ধান্য জমিতে পরিণত করেন। সেই জমিটা নিয়ে বিগত ২০০৭ সাল থেকে তাদের দুই পরিবারের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। ২০০৭ সালেও আপন চাকমা জমিতে নিহার বিন্দু চাকমার উপর লাঠি দিয়ে আঘাত হেনে অজ্ঞান করে ফেলে। এর কিছু দিন পর আপন চাকমা সংস্কারপন্থীর সশস্ত্র শাখায় যোগদান করে। এবারের ঘটনাটাও উদ্দেশ্যমূলক বলে মনে করা হচ্ছে।

লক্ষ্মীছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীদের গুলিতে তিন গ্রামবাসী গুরুতর আহত

গত ২২ অক্টোবর ২০১৩ বিকাল আনুমানিক ৩.০০ ঘটিকায় ইউপিডিএফের বিপিন চাকমা ওরফে জাল্যা, সমীর চাকমা

ওরফে তরেন ও বকুল চাকমার নেতৃত্বে ৩০-৩৫ জনের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ভারী আগ্নেয় অস্ত্র দিয়ে খাগড়াছড়ি জেলাধীন লক্ষ্মীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নস্থ বিনাজুরী গ্রামের বাসিন্দা উগ্যবাই মারমা (৩২) পিতা-চুইসাঅং মারমার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে। এ ঘটনায় ঐ বাড়িতে অবস্থানরত ৩ জন গ্রামবাসী গুরুতরভাবে আহত হয়। পরে খিরাম আর্মী ক্যাম্প থেকে একদল সেনা সদস্য ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। আহতাবস্থায় ৫ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহত তিন গ্রামবাসী হল-চুইথুইপ্রু মারমা (৩০) স্বামী উগ্যবাই মারমা, আমা মারমা (২৮) স্বামী কংচাইরুই মারমা ও উমা মারমা (৩) পিতা উগ্যবাই মারমা।

দীঘিনালায় সংস্কারপন্থী সন্ত্রাসী কর্তৃক চার গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২২ অক্টোবর ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় সুগত চাকমা এর নেতৃত্বে সংস্কারপন্থীদের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের একটি দল খাগড়াছড়ি জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ইউনিয়নের দুই গ্রাম থেকে চারজন নিরীহ গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে জানা যায়। তাদেরকে কেন অপহরণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি। অপহৃত চার গ্রামবাসী হল-লাম্বাছড়া যৌথ খামারের (১) যতীন বিকাশ চাকমা (৩৫) পিতা-জ্ঞানেন্দ্র চাকমা এবং বাজেইছড়া গ্রামের (২) রিপন চাকমা (৩০) পিতা-মন্টু চাকমা, (৩) সরল চাকমা (৫৫) পিতা-সিন্ধুরাজ চাকমা ও (৪) মন্টু চাকমা (৫২) পিতা-পূর্ণ কুমার চাকমা।

গত ২৫ অক্টোবর অপহৃত তিনজন যথাক্রমে সরল চাকমা, মন্টু চাকমা ও রিপন চাকমাকে মুক্তিপণের বিনিময়ে সন্ত্রাসীরা ছেড়ে দেয়। তবে যতীন বিকাশ চাকমাকে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সন্ত্রাসীরা মুক্তি দেয়নি।

কাউখালীতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী অপহৃত

গত ২৯ অক্টোবর ২০১৩ মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় রাঙ্গামাটি জেলাধীন কাউখালী উপজেলার ফটিকছড়ি ইউনিয়নের ফিত্তিপাড়া গ্রামবাসী নবদেব চাকমা (৩০) পিতা-শুক্ক চাকমাকে তাঁর নিজবাড়ি থেকে বিপিন চাকমা (জাল্যা) এর নেতৃত্বে আনুমানিক ১০/১৫ জনের একদল ইউপিডিএফ সশস্ত্র সন্ত্রাসী অপহরণ করে বলে জানা যায়। নবদেব চাকমা হলেন ঐ গ্রামের গরীব চাষা। ইউপিডিএফ এর কর্মকান্ড থেকে বেরিয়ে আসা ধীমান চাকমার শ্যালক। তাঁর শ্যালক ইউপিডিএফ ত্যাগ করার কারণে নবদেবকে ইউপিডিএফরা অপহরণ করে বলে গ্রামবাসীদের ধারণা।

মানিকছড়িতে ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীর গুলিতে জনসংহতি সমিতির সদস্য খুন

গতকাল ৪ নভেম্বর ২০১৩ রাত আনুমানিক ৮:৩০ টায় চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলা সদরে নিজ বাড়ির পাশে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ও বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মানিকছড়ি থানা এলাকার সংগঠক আপ্রুঅং মারমা ওরফে পেসকা (৩২) পিতা-অংশা মারমাকে গুলি করে হত্যা করে।

জানা যায়, ঘটনার সময় আপ্রুঅং মারমা ওরফে পেসকা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মানিকছড়ি উপজেলা শাখার সদস্য মংচাউ মারমা (২২) পিতা- মংচাংগ্য মারমা বাড়ির অনতিদূরে মানিকছড়ি বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ির দরোজা থেকে আনুমানিক ৮-১০ হাত দূরত্বে পৌঁছলে তারা রতন বসু, পিতা- মৃত দুলাল বসু, গ্রাম- চাইল্যাতলী, লক্ষ্মীছড়ি এর নেতৃত্বে ইউপিডিএফের ৪ সন্ত্রাসীকে দেখতে পান। কিছু বুঝে উঠার আগেই একজন সন্ত্রাসী আপ্রুঅং মারমা ওরফে পেসকাকে কাছে থেকে গুলি করে সবাই পালিয়ে যায়।

মংচাউ মারমা অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অপরদিকে গুরুতর আহতাবস্থায় আপ্রুঅং মারমা ওরফে পেসকাও দৌড়ে পার্শ্ববর্তী মানিকছড়ি থানা কমিটির সভাপতি মংচাজাই মারমা ওরফে জাপান এর বাড়িতে পৌঁছেন। কিন্তু সভাপতির বাড়িতে পৌছার পরপরই তিনি সেখানেই মারা যান।

সাংগঠনিক সংবাদ

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের লক্ষ্যে সকল বাধা অপসারণের দাবিতে ঢাকায় ১০ দলের গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ মে ২০১৩ মঙ্গলবার ১০ প্রগতিশীল বাম দল বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, গণতন্ত্রী পার্টি, গণঐক্য, সাম্যবাদী দল, গণআজাদী লীগ, বাসদ (বিএসডি), কমিউনিস্ট কেন্দ্র, গণতান্ত্রিক মজদুর পার্টি, ন্যাপ এর উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন সংশোধনের লক্ষে সকল বাধা অপসারণের দাবিতে এক গোলটেবিল আলোচনা ঢাকার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত হয়।

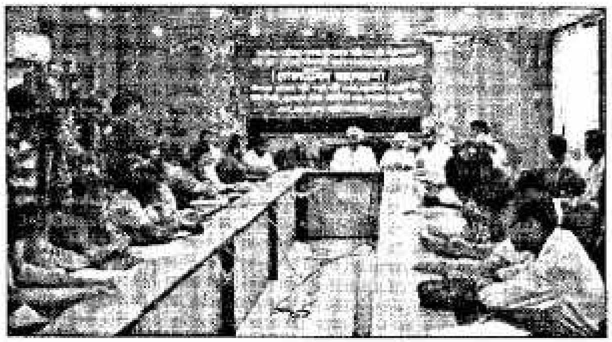

উক্ত আলোচনায় সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন এমপি। বক্তব্য রাখেন গণঐক্যের আহ্বায়ক পংকজ ভট্টাচার্য্য, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরুল রহমান সেলিম, গণ আজাদী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এইচ কে এস আরেফিন, বাসদের রেজাউর রশিদ খান, ন্যাপের ইসমাইল হোসেন, আইইডির নির্বাহী নুমান আহম্মদ খান সহ ১০ বাম দলের নেতৃবৃন্দ। আলোচনা সভায় আলোচনাপত্র উপস্থাপন করবেন কমিউনিস্ট কেন্দ্রের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. অসিত বরণ রায়। সঞ্চালনা করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগের সদস্য দীপায়ন খীসা।

গোলটেবিল আলোচনা সভায় রাশেদ খান মেনন এমপি বলেন- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এত বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও আজ অবধি পুর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন হয়নি। এরই মধ্যে চুক্তির আলোকে ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের মাধ্যমে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কিছুদিন আগে আমলাতান্ত্রিকতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের উদ্যোগ আবার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, এই সরকারের মেয়াদের মধ্যে চুক্তি বাস্তবায়ন যদি না করতে পারি তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আবার অশান্ত হয়ে যেতে পারে। পংকজ ভট্টাচার্য বলেন-আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেওয়া ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে সরকারের পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে অবিলম্বে সময়সূচিভিত্তিক রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে। তিনি আরো জানান, দশ দলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে এই বিষয়ে জানানো হবে এবং পরবর্তীতে যদি সরকার কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলে আগামীতে এই দাবীতে দশদল রাজপথে নামবে।

সর্বশেষ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিসমস্যা যথাযথ সমাধানের লক্ষ্যে এবং পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ যথাযথ ও ত্রুটিমুক্তভাবে সংশোধনের নিমিত্তে সচিবসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ের কতিপয় কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে একতরফা ও বিতর্কিতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের উদ্যোগ অতিসত্ত্বর বন্ধ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ৪র্থ ও ৫ম সভা এবং আইনমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০ জুলাই ২০১২ অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিস্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন করা এবং বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানানো হয়।

রাঙামাটিতে পিসিপির দুই যুগপূর্তি এবং ১৮তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ২০ মে ২০১৩ সকাল ১০:০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ২৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ১৮তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল উপলক্ষে রাঙামাটি জেলা সদরের রাজবাড়িস্থ জিমনেসিয়াম প্রাঙ্গণে এক বিশাল ছাত্র-জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়ন চাই' এই দাবিতে অনুষ্ঠিত এই ছাত্র-জনসমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। জনসমাবেশ শেষে বেলুন উড়িয়ে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক হোসাইন কবির, দৈনিক সমকালের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আবু সাঈদ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তনু মজুমদার, ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুর মোর্শেদ, ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক তানভীর রুসমত, পিসিপির সাবেক সভাপতি উদয়ন ত্রিপুরা, নারী নেত্রী ওয়াইচিংপ্রু মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বর্তমান সরকার তার মেয়াদের শেষ পর্যায়ে চলে আসলেও এখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য

কোন কাজ করেনি বলে অভিযোগ করেন এবং সরকারের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যেই চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শেষ করার দাবি জানান। বক্তারা আরো বলেন, বাংলাদেশ এক জাতি রাষ্ট্র বা এক ভাষাভাষি মানুষের দেশ নয়, তাই সব জাতি, ধর্ম, বর্ণের মানুষের মৌলিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে।

অপরদিকে বিকাল ৩:০০ টায় রাঙামাটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আলোচনা সভা এবং সন্ধ্যায় গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর পরিবেশনায় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ২১ মে ২০১৩ প্রতিনিধি সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনসংহতি সমিতি'র সহ-সভাপতি উষাতন তালুকদার বলেন, মহান নেতা এম এন লারমার চেতনাকে বুকে ধারণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তাই আদর্শভিত্তিক মানবিক সমাজ গঠনে ছাত্রসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এতে আরও বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, জনসংহতি সমিতি রাঙামাটি জেলার ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সাধারণ সম্পাদক ইন্টুমনি তালুকদার প্রমুখ। পরে ত্রিজিনাদ চাকমাকে সভাপতি, জ্যোতিষমান চাকমা বুলবুলকে সাধারণ সম্পাদক ও মংক্ক মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পিসিপির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে

মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদ দিবস পালিত

গত ১২ জুন ২০১৩ হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৭তম প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

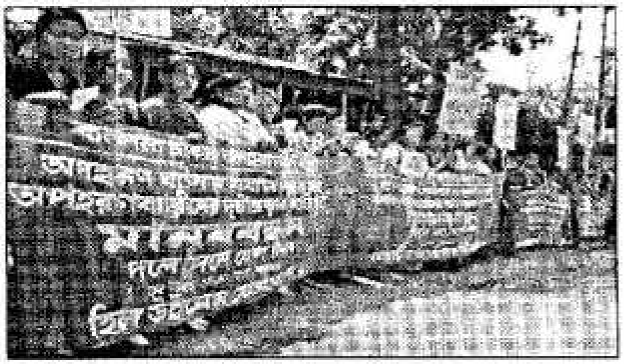

রাঙ্গামাটি: দিবসটি উপলক্ষে ঐদিন 'অপহরণ ঘটনার যথাযথ বিচার চাই, অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই' এই দাবীকে সামনে রেখে রাঙ্গামাটিতে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে সকাল ১০:৩০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি জড়িতা চাকমার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনের সভায় বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক তাপস চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা প্রমুখ।

বান্দরবান: একই দাবীতে ঐদিন সকাল ১০:০০ টায় বান্দরবানে জেলা সদরের প্রেসক্লাব চত্বরে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগেও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি ওয়েইচিং প্রু মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মানববন্ধনের সভায় বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা, জনসংহতি সমিতির বান্দরবান সদর থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক উসচিং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক উবাচিং মারমা, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান কলেজ শাখার সভাপতি সাইন থোয়াই মারমা ও সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ।

ঢাকা: দিবসটি উপলক্ষে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে রাজধানী ঢাকার সেগুন বাগিচাস্থ মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের মিলনায়তনে ঐদিন সকাল ১০:০০টায় এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গোলটেবিল বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা এবং 'অপহরণ ঘটনার যথাযথ বিচার চাই, অপহরণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই' শিরোনামের প্রবন্ধ পাঠ করেন নারী অধিকার কর্মী রিপু মারমা। এতে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক-দালাল নির্মূল জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক শাহরিয়ার কবির, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শক্তিপদ ত্রিপুরা, জাতীয় মহিলা পরিষদের এ্যাডভোকেসী সমন্বয়ক জনা গোস্বামী, এএলআরডি'র পরিচালক রওশন জাহান মনি প্রমুখ

চট্টগ্রাম: চট্টগ্রামেও হিল উইমেন্স ফেডারেশন, চবি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের চবি ও মহানগর শাখা ও পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের উদ্যোগে কল্পনা চাকমা অপহরণের ১৭তম প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত করা হয়।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উদ্যোগে একটি প্রচারপত্রও প্রকাশ ও প্রচার করা হয়। প্রচারপত্রে সরকারের উদ্দেশ্যে সন্নিবেশিত দাবীসমূহ হল-১) অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ ঘটনা এবং অপহরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হত্যার শিকার রূপন চাকমা, সুকেশ চাকমা, মনোতোষ চাকমা ও সমর বিজয় চাকমা হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচারের ব্যবস্থা করা হোক। (২)

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। (৩) পার্বত্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান, অত্রাঞ্চলে সার্বিক উন্নয়ন, শান্তি এবং নারী সমাজের নিরাপত্তা ও অগ্রগতির স্বার্থে অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা হোক।

১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য ভূমি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধনের দাবি ১০ দলের

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ মোতাবেক তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের দাবি জানিয়েছে ১০ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দল।

গত ৩০ জুন ২০১৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ঢাকাস্থ হোটেল সুন্দরবনে ১০ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দল কর্তৃক আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ১০ দলের নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, গণ আজাদী লীগের সভাপতি হাজী আবদুল সামাদ, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক নুরুর রহমান সেলিম, কমিউনিস্ট কেন্দ্রের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা. অসিত বরণ রায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা ও সদস্য দীপায়ন খীসা, সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় সদস্য বাবুল বিশ্বাস, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক রাজেউর রশিদ খান, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান মল্লিক, গণআজাদী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট এস কে শিকদার, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজীব মীর প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে ১০ দলের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ঐক্যন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য।

সংবাদ সম্মেলনে রাশেদ খান মেনন বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে শুভ উদ্যোগ। কিন্তু ক্রটিপূর্ণভাবে ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশকে অবজ্ঞা করে বিল পাশ হলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিবিরোধ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি হবে না। এতে পার্বত্যাঞ্চলের ভূমি সমস্যা অব্যাহত থাকবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, উত্থাপিত বিলে 'বেদখল হওয়া জমি' বিরোধগুলো ভূমি কমিশনের আওতায় বাইরে রাখা হয়েছে। এটা করা হলে শুধুমাত্র ৩৫ শতাংশ ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি হবে। বাকী ৬৫ শতাংশ ভূমিবিরোধ অনিষ্পন্ন থেকে যাবে বলে রাশেদ খান মেনন আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হলেও ভূমি কমিশন আইনের সংশোধনী বিলে সচতুরভাবে 'পদ্ধতি' শব্দটি বাদ হয়েছে। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'পদ্ধতি' শব্দটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের পক্ষ লিখিত বক্তব্যে ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য বলেন, ইতোমধ্যে সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত ১৩ দফা সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে মাত্র ১০টি সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত বিলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর ৩টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব বাদ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে উত্থাপিত ১০টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে ৮টি সংশোধনী যথাযথভাবে সংশোধনী বিলে অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ২টি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাব উক্ত বিলে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। ৩টি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অসংশোধন রেখে ও ২টি ধারা ক্রটিপূর্ণভাবে সংশোধন করলে পার্বত্য ভূমিবিরোধ যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গভাবে নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে বলে পঙ্কজ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেন।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১' এর বিরোধাত্মক ধারা সংশোধনের লক্ষ্যে গত ৩ জুন ২০১৩ 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩' বিল মন্ত্রীসভায় অনুমোদন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১৬ জুন ২০১৩ জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের শাখা কাউন্সিল সম্পন্ন

ঢাকায় সভাপতি-জেনী বম, সাধারণ সম্পাদক-মনিরা ত্রিপুরা
বিলাইছড়িতে সভাপতি-ন্যান্সি রাখাইন
সাধারণ সম্পাদক-হ্যাপী চাকমা

ঢাকা মহানগর শাখা: গত ২০ জুলাই ২০১৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর শাখার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রনেতা জুয়েল চাকমা। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, পিসিপির সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক চন্দ্রা ত্রিপুরা। কাউন্সিলে জেনী বমকে সভাপতি, লিন্ডা লুসাইকে সহ-সভাপতি, মনিরা ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক, জেনী

চাকমাকে সহ-সাধারণ সম্পাদক, চন্দ্রা ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক, লুম্বিনী চাকমাকে অর্থ সম্পাদক, এসাইনু মারমাকে তথ্য ও প্রচার সম্পাদক, মিথিলা চাকমাকে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক করে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ঢাকা মহানগর শাখার ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

বিলাইছড়ি উপজেলা শাখা: গত ৭ অক্টোবর ২০১৩ রাঙ্গামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা সদরস্থ ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে হিল উইমেন্স ফেডারেশন, বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। ন্যাঙ্গী রাখাইন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির বিলাইছড়ি থানা শাখার সভাপতি শুভমঙ্গল চাকমা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চঞ্চনা চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি বাচ্চু চাকমা, পিসিপির বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি দীপায়ন দেওয়ান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হ্যাপী চাকমা এবং সভা সঞ্চালনা করেন বীরোত্তম চাকমা। কাউন্সিলে ন্যাঙ্গি রাখাইনকে সভাপতি এবং হ্যাপী চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিলাইছড়ি উপজেলা শাখার ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

তাইন্দং-এ সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের উপর হামলা

সাম্প্রদায়িক হামলা ও সরকারি কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততার প্রতিবাদে জনসংহতি সমিতির বিক্ষোভ

খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা-তাইন্দং এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্ম গ্রামে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট; ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের নির্লিপ্ততার প্রতিবাদে ৫ আগস্ট ২০১৩ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলা সদরে মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ৩ আগস্ট ২০১৩ খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দং এলাকায় সেটেলার বাঙালি কর্তৃক জুম্মদের ১১টি গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুঠপাট চালানো হয়। হামলায় সর্বেশ্বর পাড়ায় বৌদ্ধ বিহারের ৩৬টি ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং প্রায় ৪০০ ঘরবাড়ীতে লুঠপাট ও ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া হামলায় শিশুসহ অন্তত ১২ জন জুম্ম আহত হয়।

রাঙ্গামাটি: জনসংহতি সমিতির সহ সভাপতি ঊষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি গুণেন্দু বিকাশ চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সহ সাধারণ সম্পাদক টোয়েন চাকমা। মানববন্ধন পরিচালনা করেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক স্টাফ সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা এবং স্মারকলিপি পাঠ করেন জনসংহতি সমিতির সহ তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সজীব চাকমা।

বিজিবি ও পুলিশের সামনে এই হামলা সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করে বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন যে, সরকার যদি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ হয়, তাহলে এই জঘন্য সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে এগিয়ে আসতো।

তিনি বলেন, সরকারের পক্ষ থেকে বার বার আক্রান্ত জুম্মদের জানমালের নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হয়, কিন্তু সেই আশ্বাস বাস্তবায়ন করা হয় না। কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণ জুম্ম জনগণের উপর এ ধরনের সংঘবদ্ধ হামলা হয় কেন? তিনি আরো অভিযোগ করেন, কিছু কায়েমী সুবিধাবাদী মহল সাধারণ মানুষকে উস্কানী দিয়ে এধরনের হীন কর্মকান্ড সংঘটিত করে থাকে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির স্বার্থে সাম্প্রদায়িক উস্কানীদাতা সেটেলার বাঙালি এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, প্রশাসনসহ সরকারকে আহ্বান জানান। তিনি সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কেবল প্রতিশ্রুতির মধ্যে না থেকে প্রকৃত বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বান্দরবান: জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি সাধুরাম ত্রিপুরার সভাপতিত্বে বান্দরবান প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য জলিমং মারমা ও চিংহ্লামং চাক, পিসিপি'র বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিত্যলাল তঞ্চঙ্গ্যা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। মানববন্ধন পরিচালনা করেন জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্যবা মারমা।

রাঙ্গামাটিতে মানববন্ধন শেষে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষ থেকে রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমার স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির স্মারকলিপিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াকে দ্রুত ও যথাযথভাবে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে এবং পার্বত্যাঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর উগ্র ও জঙ্গী সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী ইউপিডিএফের সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে আক্রান্ত জুম্মদের স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আসা এবং তাদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন প্রদান

করা; গত ৩ আগস্টে জুম্মদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা এবং হামলায় জড়িত সেটেলার বাঙালিদের অচিরেই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা; পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ'কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং এর সশস্ত্র সন্ত্রাসী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সেটেলার বাঙালিদের সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন প্রদান করা ইত্যাদি দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়।

চট্টগ্রামে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের বার্ষিক সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৩ আগস্ট ২০১৩ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় চট্টগ্রামের ফ্রি পোর্ট ব্যারিস্টার কলেজ সংলগ্ন রূপসী কমিউনিটি সেন্টারে 'দুনিয়ার শ্রমিক এক হও, শ্রমজীবি মানুষের আত্মমর্যাদা:পূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে আসুন'-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম কর্তৃক বার্ষিক সম্মেলন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চিকো চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রণতি বিকাশ চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পিসিপির সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক তাপস হোড়, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. আবু হানিফ, প্রীতিলতা ট্রাস্টের সদস্য অধ্যাপক প্রদীপ দত্ত, শ্রমিক নেতা জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার কলেজ ব্যবসায়ী সমিতি সভাপতি ইব্রাহীম খলিল বাদশা, পিসিপি চট্টগ্রাম মহানগর শাখা সহ-সভাপতি ধনঞ্জয় চাকমা, যুব মৈত্রীর কায়সার আলম। আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন সুকাম চাকমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদায়ী কমিটির অর্থ সম্পাদক রনেল চাকমা। সম্মেলন অধিবেশনে সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন সাংগঠনিক সম্পাদক পূর্ণ জীবন চাকমা।

প্রধান অতিথি প্রণতি বিকাশ চাকমা বলেন, 'আমাদের সকলের জন্মভূমি পাহাড় বর্তমানে নানা সমস্যায় র্জজরিত। শোষকদের ষড়যন্ত্রের কারণে পাহাড়ে বসবাসরত আদিবাসী জাতিসমূহের অস্তিত্ব আজ হুমকির মুখে।' তিনি বলেন, 'সরকার পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন না করে সমতলের নদী ভাঙা এলাকা, রেল লাইনে পড়ে থাকা লোকজন নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের জায়গাগুলো একের পর এক দখল করে নিচ্ছে। আমরা কিছুই করতে পারছি না।' তাই তিনি শহরমুখী না হয়ে নিজ নিজ গ্রামে যে জায়গাগুলো আছে সেখানে উৎপাদনের ব্যবস্থা করে মর্যাদাপূর্ণ জীবন প্রতিষ্ঠা করার জন্য আদিবাসী শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বর্তমান যুব সমাজকে এম এন লারমার চেতনায় উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানান।

এ্যাড. আবু হানিফ বলেন, এম এন লারমার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীরা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম শিখেছে। তাপস হোড় বলেন, পাহাড়ি আদিবাসীদের অধিকার সরকারকে দিতে হবে। পার্বত্য চুক্তির প্রতিটি ধারার দাঁড়ি, কমা ও মাত্রাসহ অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এরপর আলোচনার শেষ পর্যায়ে সুমন চাকমাকে সভাপতি, সুকাম দেওয়ানকে সাধারণ সম্পাদক ও পূর্ণ জীবন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে এক বছর মেয়াদি ২১ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ী শ্রমিক কল্যাণ ফোরামের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

পিসিপি রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ১৬তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রাঙ্গামাটির রাজবাড়িস্থ আশিকা মাঠ প্রাঙ্গণে সকাল ১০:০০ টায় "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংরক্ষণে ছাত্রসমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন জোরদার করুন" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার ১৬তম বার্ষিক শাখা সম্মেলন ও কাউন্সিল এর উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি রননজয় চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, পিসিপির সহ-সাধারণ সম্পাদক টোয়েন চাকমা, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি সৈকত রঞ্জন চৌধুরী, পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সভাপতি সুর্নিমল দেওয়ান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ছাত্রনেতা রনো চাকমা এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালন' করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, 'ছাত্র সমাজকে গণমুখী জ্ঞান অর্জন করতে হবে। গতানুগতিক জ্ঞান অর্জন করে শুধুমাত্র নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সমাজ ও জাতির জন্য কিছুই করা যাবে না। সেজন্য যে জ্ঞান ছাত্রসমাজ অর্জন করবে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে সমাজ ও দেশের জন্য কাজ করে যেতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভূমি বেদখল

চলছে। যার দৃষ্টান্ত উদাহরণ হিসেবে তাইন্দং এর সাম্প্রদায়িক হামলা ও লুটপাতের মতো নৃশংস ঘটনা সংগঠিত করা হয়।'

কাউন্সিলে বাচ্চু চাকমাকে সভাপতি, অধিরাম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও রিন্টু চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন রাঙ্গামাটি জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। নবনির্বাচিত জেলা কমিটিকে শপথবাক্য পাঠ করান পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী সহ-সভাপতি ধীরেশ চাকমা।

লামায় জুম্ম গ্রামে হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বান্দরবান: গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে বান্দরবান প্রেসক্লাব চত্বরে লামায় ভূমিদস্যু মুজিবুল হকের সন্ত্রাসী বাহিনী কর্তৃক জুম্মদের ভূমি জবরদখল ও হামলার প্রতিবাদে এবং ভূমিদস্যুদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবীতে এক মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা শাখার সহ সভাপতি চিংলামং চাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ক্যবা মারমা। এছাড়া বক্তব্য প্রদান জনসংহতি সমিতির নেতা উছোসিং মারমা ও ওয়াইসিং প্রু মারমা এবং পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মন্তু মারমা।

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ভূমিদস্যু সেটেলার বাঙালি মুজিবুল হক মাষ্টার (মুজিবুল লিডার) গ্রুপের ২০-৩০ বাঙালি সন্ত্রাসী দল বান্দরবান জেলার লামা উপজেলার রূপসী ইউনিয়নের পলিঝিড়ি (পলিক্ষ্যাং) এলাকায় জুম্মদের ভূমি জবরদখল করতে গেলে জুমে কর্মরত জুম্মদের উপর হামলা চালায়। এ হামলায় ২ জন মহিলাসহ ৮ জন নিরীহ জুম্ম গ্রামবাসী আহত হয়। সন্ত্রাসীরা জুম্মদের জুমঘরও ভেঙে দেয়।

বক্তারা অভিযোগ করেন, হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ১৩ জনকে আটক করেছে বলে দাবী করলেও হামলার মূল হোতা মুজিবুল হক ও তার ছেলে প্রকাশ্যে ঘুরাফিরা করছে। তারা হামলার মূল হোতা ও ভূমিদস্যু মুজিবুল হক ও তার ছেলে মো: জহিরসহ হামলায় জড়িতদের অচিরেই গ্রেফতার করা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা; ভূমিদস্যু কর্তৃক লামায় জুম্মদের জায়গা-জমি জবরদখলের বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি মোতাবেক অচিরেই পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি করার দাবি জানান।

রাঙ্গামাটি: গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রাঙ্গামাটিতে বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় রূপসী ইউনিয়নে ভূমি বেদখলকারী সন্ত্রাসী মুজিবুল হক এর নেতৃত্বে আদিবাসী গ্রামে হামলা ও ভূমি বেদখলের প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিল শেষে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুব সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সংগ্রামী সাংগঠনিক সম্পাদক সমর জ্যোতি চাকমা। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় স্টাফ সদস্য উদয়ন ত্রিপুরা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির সহ-সাধারণ সম্পাদক শরৎ জ্যোতি চাকমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, পিসিপি সহ-সভাপতি রিপেশ চাকমা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধিরাম চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে মুজিবুল হকের মতো সন্ত্রসীরা লামা উপজেলায় রূপসী ইউনিয়নে ভূমি বেদখল ও আদিবাসীদের গ্রামে হামলা করার সাহস পাচ্ছে এবং তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে।'

নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যাসহ রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যাতে যথাযথ বাস্তবায়ন করা হয় তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সরকারের কাছে উদাত্ত আহ্বান জানান। এছাড়া নেতৃবৃন্দ মুজিবুল হক এর নেতৃত্বে আদিবাসীদের গ্রামে যারা হামলা চালিয়েছে তাদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

শিক্ষা কোটা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন দাবীতে পিসিপি'র জাতীয় শিক্ষা দিবস পালিত

রাঙ্গামাটি: গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রাঙ্গামাটি ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় প্রাঙ্গণে "আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ, মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা সিট বৃদ্ধি, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগসহ প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের দাবীতে" পিসিপি'র রাঙ্গামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে এক মানববন্ধন আয়োজন করা হয়। মানববন্ধন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধিরাম চাকমা।

মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সংগ্রামী সভাপতি ছাত্রনেতা ত্রিজিনাদ চাকমা। পিসিপির রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সভাপতি বাচ্চু চাকমা সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন পিসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা রিপেশ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্থ সম্পাদক ঝুমুর

চাকমা, পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক ছাত্রনেতা দীপেশ চাকমা, জেলা শাখার সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা অন্তিক চাকমা প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ছাত্রনেতা ত্রিজিনাদ চাকমা বলেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এর ধারা ১৮ অনুযায়ী উল্লেখ আছে- "ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে"। কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই যে, যেখানে জাতীয় পর্যায়েই এখনো কেবল দারিদ্রের কারণেই ৫০ ভাগ শিশু পঞ্চম শ্রেণী পার হতে না হতেই ঝরে পড়তে বাধ্য হয় সেখানে শিক্ষার অবস্থা আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে অত্যন্ত নাজুক হবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা, নীতিমালা ও উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী।

পরিশেষে সমাপনী বক্তব্যে জেলা শাখার সভাপতি ছাত্রনেতা বাচ্চু চাকমা মানববন্ধনে ৫ দফা দাবিনামা তুলে ধরে সেগুলো যথাযথ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে সরকারের কাছে জোর দাবি জানিয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন এবং মানববন্ধন অনুষ্ঠান সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

বান্দরবান: এই দিন সকাল ১০:০০ টায় জাতীয় শিক্ষা দিবস উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার উদ্যোগে বান্দরবান সদরে মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি সাইংথোয়াই মারমার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যার সঞ্চলনায় সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি মস্ত মারমা। ছাত্র সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের বান্দরবান জেলা শাখার সহ-সভাপতি নিত্যলাল চাকমা, সাধারণ সম্পাদক উব্যসিং মারমা, বান্দরবান সদর থানা শাখার সভাপতি উসাইনু মারমা, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সুপেন তঞ্চঙ্গ্যা ও বান্দরবান সরকারি কলেজ শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক অংশৈ মারমা প্রমুখ।

সমাবেশে ছাত্র নেতৃবৃন্দ আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালু, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটার আসন বৃদ্ধি, বান্দরবান সরকারি কলেজে পর্যাপ্ত অনার্স কোর্সসহ মাস্টার্স কোর্স চালু করা, বান্দরবান সরকারি কলেজ, বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজ ও টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ এবং অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

ঢাকা: সকাল ১১:০০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জাতীয় শিক্ষা দিবসকে সামনে রেখে বিভিন্ন দাবি নিয়ে পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে একটি মিছিল ও ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে একটি মিছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে টিএসসি প্রদক্ষিণ শেষে ডাকসু'র সামনে সমাপ্ত হয় এবং সেখানে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ আদিবাসী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি পারী চিং থাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সঞ্চালনা করেন পিসিপির ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জেমসেন আমলাই। এছাড়া সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিস্মান চাকমা বুলবুল, হিল উইমেন্স ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি চঞ্চনা চাকমা, বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল ঢাকা মহানগর শাখার আহবায়ক পাই চাউ মারমা এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন এর ঢাকা মহানগর শাখার শিক্ষা ও সাহিত্য প্রকাশনা সম্পাদক মিথিলা চাকমা।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অবিলম্বে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণ; উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত কোটা সিট বৃদ্ধি; আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে শিক্ষা প্রসারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ, উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিকরণ; বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনপূর্বক শিক্ষা ক্ষেত্রে আদিবাসী সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তিকরণ; পাঠ্যপুস্তকে আদিবাসী সাহিত্য,সংস্কৃতি, রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তি ও ঐতিহ্যসমূহকে সন্নিবেশিত করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান।

বিভিন্ন দাবি নিয়ে পলিটেকনিক শিক্ষাবোর্ডের মহাপরিচালকের সাথে পিসিপি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাত

গত ৮ অক্টোবর ২০১৩ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দাবি নিয়ে পলিটেকনিক শিক্ষাবোর্ডের মহাপরিচালকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। নেতৃবৃন্দ কাপ্তাই সুইডিশ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে জুম্ম শিক্ষার্থীদের জন্য ৫০% আসন সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন এবং দেশের বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে জুম্ম শিক্ষার্থীদের জন্য বর্তমানে সংরক্ষিত ২% আসন ৫% এ বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের দাবি সম্বলিত একটি আবেদনপত্র মহাপরিচালকের কাছে পেশ করেন। এ সময় মহাপরিচালক মহোদয় নেতৃবৃন্দের দাবির প্রতি গুরুত্বারোপ করে তা বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

পিসিপি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পিসিপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিস্মান চাকমা বুলবুল। এছাড়াও প্রতিনিধিদলের সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় সদস্য মেরিন চাকমা, ঢাকা মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক জেমশন আমলাই বম এবং ঢাকা মহানগর শাখার তথ্য, প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক সুলভ চাঙমা চেঙ্গা। সাক্ষাৎকালে নেতৃবৃন্দ বম, পাংখোয়া, লুসাই, খুমী, ম্রো, চাক প্রভৃতি অধিকতর পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পলিটেকনিক ভর্তি পরীক্ষার শর্তাবলী শিথিল করার দাবি জানালে কর্তৃপক্ষ তা আগামীতে বিবেচনা করার আশ্বাস দেন।

রাইখালী ইউনিয়ন যুব সমিতির সম্মেলন ও কাউন্সিল সম্পন্ন

আনিমং মারমা সভাপতি, উবাচিং মারমা সাধারণ সম্পাদক

গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ সকাল ১০:০০ টায় পার্বত্য চট্টগ্রাম যুব সমিতি রাইখালী ইউপি শাখার বার্ষিক সম্মেলন ও কাউন্সিল

অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতি রাঙামাটি জেলা শাখার সহ-সভাপতি সুবর্ণ চাকমা। এছাড়া বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি মনুচিং মারমা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা, পিসিপির রাঙামাটি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অধিরাম চাকমা, যুব সমিতির কাপ্তাই থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রূপম চাকমা প্রমুখ।

সম্মেলন ও কাউন্সিলে আনিমং মারমাকে সভাপতি, উবাচিং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিংথোয়াই মারমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ঘোষণা করা হয়। নব নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান যুব সমিতি কাপ্তাই থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক রূপম চাকমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান সন্তু লারমার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বিকেলে "নবীনের আগমন বয়ে আনুক ঐক্যের সজীবতা, শিকড় ও সংস্কৃতি রক্ষায় দৃঢ় হোক জুম্ম জাতির একতা"-এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগর কমিটি কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে আয়োজিত নবীনবরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পিসিপি ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি জুয়েল চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সহিদ আকতার হুসাইন ও পিসিপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিস্মান চাকমা বুলবুল।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সন্তু লারমা বলেন, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের সংগ্রামে সামিল হতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু জুম্ম জাতির জন্য নয়, দেশের বিভিন্ন আদিবাসীর চলমান সংগ্রামে একাত্ম হতেও আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরো বলেন, জ্ঞানার্জনের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজের জাতি ও সমাজের সেবা করা এবং সমাজব্যবস্থাকে জানা। দুর্ভাগ্যজনকভাবে জুম্ম তরুণদের একটি অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিবিরোধী অবস্থান নিয়ে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করেছে। তিনি আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সরকার চুক্তি বাস্তবায়নে জুম্ম জনগণের সাথে নানা তালবাহানা করেছে। চুক্তি বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী মহল এবং চুক্তিবিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন ইউপিডিএফ এখনও সক্রিয়ভাবে তৎপর বলে তিনি অভিযোগ করেন। অবিলম্বে ইউপিডিএফকে নিষিদ্ধ এবং তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে সরকারের নিকট জোর দাবী জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বর্তমানে ঢাকায় অধ্যয়ন করতে আসা জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যান্য জুম্ম ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে অনেকখানি এগিয়ে রয়েছে এবং সমাজ তাদের কাছে অনেক কিছুর দাবীদার। তাই আজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে জাতির ক্রান্তিলগ্নে নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, চুক্তি বাস্তবায়নের সংগ্রামসহ আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি আদায়ের সংগ্রামে ছাত্র-যুবসমাজকে সামিল হওয়ার আহবান জানান।

বিশেষ অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য সহিদ আকতার হুসাইন বলেন, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জুম্মদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের পক্ষে। তবে একটি স্বার্থান্বেষী মহল আদিবাসীদের সঙ্গে বাঙালিদের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে রাখতে চায়। অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার বলেন, পাহাড়িরা দেশের মূল জনগোষ্ঠীর থেকে এখনো অনেক পিছিয়ে। তাই তাদের জন্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পাঠ্য বিষয়ে ব্যবস্থা করে দেওয়া উচিৎ এবং কোটা নিশ্চিত করা উচিত।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ "আত্মার বাঁধন গাথা যে মাটির মূলে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার করবো প্রতিষ্ঠা সেথায় সকলে"-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আয়োজনে নবীনবরণ ও বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

আনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের সম্মানিত ডীন প্রফেসর হোসাইন কবির, নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান সাদাফ নূর-এ ইসলাম, সহকারী প্রক্টর আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক

আনন্দ বিকাশ চাকমা ও পিসিপির সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা এবং পিসিপির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার পক্ষে বক্তব্য রাখেন শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক ধনবিকাশ চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সন্তু লারমা বলেন, কেবল প্রাতিষ্ঠানিক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করে না। তার বাইরে অনেক বিষয় জানতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি নিজেকে জানা, কেন সমাজে শোষণ-বঞ্চনা থাকে, সমাজে কেন বৈষম্য সৃষ্টি হয়- এসব বিষয়গুলো জানতে হবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৪২ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখনো জনগণ গণতান্ত্রিক শাসন পায়নি। একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সংবিধান পায়নি। দেশের মানুষ যদি তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার পেতে চায়, তাহলে একটি গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক সরকার তথা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যতদিন না দেশে একটি গণমুখী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায়, ততদিন পর্যন্ত নারীর উপর বৈষম্য অবসান হতে পারে না। এটা সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নীতি-আদর্শের ভিত্তিতে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরো বলেন, কেন আজকে ১৬ বছরেও পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি তা খুঁজে কারণ বের করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো 'অপারেশন উত্তরণ' নামে এক প্রকার সেনাশাসন আছে। সরকারের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তি ক্রিয়াশীল রয়েছে। ইউপিডিএফ নামে চুক্তিবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন জন্ম দেয়া হয়েছে। তারা অবাধে সন্ত্রাস চালিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনকে জিম্মি করে ফেলেছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি ছাত্র নেতা প্রতিম চাকমা। উল্লেখ্য যে, এবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১২-১৩ সেশনের ১৩১ জন আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয় ৬৫ জন ছাত্র-ছাত্রী তাদের স্নাতক কোর্স শেষ করেন।

রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ: গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৩ রাঙ্গামাটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে "পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের কলেজগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী কোটা সিট বৃদ্ধি করতে হবে" এই দাবীকে সামনে রেখে পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার উদ্যোগে নবীন বরণ অনুষ্ঠান ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়।

নবীন বরণ ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সভাপতি রিন্টু চাকমা এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ঊষাতন তালুকদার। পিসিপির রাঙ্গামাটি কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক দীপেশ চাকমার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম এন লারমা মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের আহ্বায়ক বিজয় কেতন চাকমা, আদিবাসী ফোরামের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি প্রকৃতি রঞ্জন চাকমা, জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কমিটির ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক পলাশ তঞ্চঙ্গ্যা, পিসিপি'র সভাপতি ত্রিজিনাদ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রিমিতা চাকমা। এছাড়া স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিপির রাঙ্গামাটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার সহ-সভাপতি রিটন চাকমা এবং নবীনদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন নবীন বন্ধু সুপিয়ন চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঊষাতন তালুকদার বলেন, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের প্রতিটি কর্মী বন্ধুদের প্রগতিশীল আদর্শেই আদর্শিত হয়ে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে যে কোন কঠিন পরিস্থিতির সাথে মোকাবেলা করে আগামী দিনে জুম্ম জাতির অধিকারের সনদ পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন জোরদারকরণে এম এন লারমার আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে।

নবীনদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন, ছাত্র সমাজের অগ্রগামী অংশ হিসেবে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে জাতির জন্য কাজ করতে হবে। শুধুমাত্র গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের স্বার্থের জন্য চাকুরী নিয়ে জীবনকে সুন্দর করবেন অন্যদিকে জাতির অস্তিত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে সেটা কখনও হতে পারে না। সেজন্য পরিবেশ পরিস্থিতির সামগ্রিক বাস্তবতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজ পরিবর্তনের কাজে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল'

জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে পাশের দাবিতে জনসংহতি সমিতির বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ইতোপূর্বে গৃহীত ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল' পাশ করার দাবীতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সমাবেশ শেষে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

রাঙ্গামাটি: গত ২০ অক্টোবর ২০১৩ সকাল ১০:৩০ টায় রাঙ্গামাটিতে জনসংহতি সমিতির উদ্যোগে ইতোপূর্বে গৃহীত ১৩-দফা সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন

(সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল' পাশ করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জনসংহতি সমিতির রাঙ্গামাটি জেলা কার্যালয় প্রাঙ্গন থেকে সকাল ১০:৩০ টায় বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে বনরূপা ঘুরে ডিসি অফিসের সামনে এসে সমাপ্ত হয় এবং সেখানেই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সহ-সভাপতি ঊষাতন তালুকদার এবং বক্তব্য রাখেন জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা, পিসিপির সহ-সাধারণ সম্পাদক টোয়েন চাকমা। সমাবেশের শেষ পর্যায়ে স্মারকলিপি পাঠ করে শোনান পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা।

বিক্ষোভ সমাবেশের সভাপতি ঊষাতন তালুকদার বলেন, 'আমরা বরাবরই শান্তি চাই। শান্তি চাই বলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি করেছি। শান্তি চাই বলে, উন্নয়ন-সমৃদ্ধি চাই বলে, আমরা চুক্তি স্বাক্ষরের ১৬ বছর পরেও সরকারের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে, সরকারের সমস্যাকে অনুধাবন করে, সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে আছি। আমরা আশায় বুক বেঁধে আছি যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য সমস্যাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে, উপলব্ধি করে পদক্ষেপ নেবেন।' তিনি আরও বলেন, সরকার চাইলে, সদিচ্ছা থাকলে এই মুহূর্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইনটি যথাযথভাবে সংসদে পাশ করতে পারে।' তথ্য ও প্রচার সম্পাদক মঙ্গল কুমার চাকমা বলেন, বর্তমান মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসেও যদি 'ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (সংশোধন) আইন ২০১৩ বিল' যথাযথভাবে সংসদে পাশ না করেন তাহলে মানুষ এই সরকারকে 'বেইমান' হিসেবেই অভিহিত করবে। সমাবেশ শেষে ঊষাতন তালুকদারের নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারের নিকট যান এবং প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরিত স্মারকলিপিটি হস্তান্তর করেন। ডেপুটি কমিশনার অনতিবিলম্বে স্মারকলিপিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করা হবে উল্লেখ করেন।

বান্দরবান: গত ২২ অক্টোবর ২০১৩ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় বান্দরবান জেলা প্রেসক্লাব চত্বরে জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমোবেশে সভাপতিত্ব করেন পার্টির জেলা শাখার সহ-সভাপতি চিংলামং চাক। বক্তব্য রাখেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য লয়েল ডেভিড বম, জনসংহতি সমিতি বান্দরবান সদর থানা শাখার সভাপতি উচসিং মারমা, পিসিপির বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্র মারমা, পিসিপির বান্দরবান কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক অজিত তঞ্চঙ্গ্যা এবং সমাবেশ পরিচালনা করেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা। সমাবেশের শুরুতে একটি বিক্ষোভ মিছিল বান্দরবান শহর প্রদক্ষিণ করে।

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office,
Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. Phone & Fax: +880-351-61248
Email: pcjss@hotmail.com, pcjss@gmail.com

Website: www.pcjss.org

Price: TK 50.00 only